পশ্চিমবঙ্গ

জুন-জুলাই ২০১৮

উত্তরবঙ্গ

উন্নয়নের উড়ানে

খড়গপুর আইআইটি-র সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, রাজ্যপাল কেশরিনাথ ত্রিপাঠী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী, দুজনেই রাজ্যের এই আইআইটি-র ভূয়ষী প্রশংসা করেন। ২০ জুলাই, ২০১৮।

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র
বর্ষ-৫১ সংখ্যা ২-৩
জুন-জুলাই ২০১৮

মূল্য : ৫০ টাকা

সূ • চি • প • ত্র

সম্পাদকীয় ৩

উন্নয়নের অভিমুখ ৪

রাজ্যে সম্প্রতি শেষ হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই যে আগামী দিনে এগোবে রাজ্য সরকার, তা আবার প্রমাণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটের ফল প্রকাশের পরেই ফের উত্তরবঙ্গ সফরে তিনি। মে মাসের শেষ সপ্তাহে এবং জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে পর পর দুবার উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী।

বাংলার প্রথম সাফারি পার্কের উদ্‌বোধন হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। উত্তরবঙ্গ পর্যটনের অনন্য আকর্ষণ আজ এই বেঙ্গল সাফারি পার্ক। রয়েছে একটি সচিত্র প্রতিবেদন।

প্রচ্ছ নিবন্ধ

উত্তরবঙ্গ : উন্নয়নের উড়ানে ৪

উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক সফরে মুখ্যমন্ত্রী ১৬

সাত বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ১৯

উত্তরবঙ্গ পর্যটনের অনন্য আকর্ষণ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বেঙ্গল সাফারি ২৮

বাংলায় চালু হল বাংলাশ্রী এক্সপ্রেস ৪৪

উন্নয়নের দাবিতে অর্থ কমিশনের কাছে ঋণের বোঝা লাঘবের দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ৫৪

অসমের খসড়া নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ প্রকাশ ৬৩

রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ ৬৪

- নাগরিকপঞ্জি: অসমে ভারতীয় নাগরিকদের উদ্বাস্তু করার চক্রান্ত প্রত্যাহার করুক কেন্দ্র
- রাজ্যের ন্যায্য বরাদ্দ অর্থ মিটিয়ে দিক কেন্দ্র

সংবাদ শিরোনামে ৬৫

ফটোফিচার ৬৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক
আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
সুপ্রিয়া রায়

সহ-সম্পাদক
রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য

আলোকচিত্র
অশোক মজুমদার

অলংকরণ
সুরজিৎ পাল

প্রথম প্রচ্ছদ পরিচিতি
কালিম্পংয়ে মুখ্যমন্ত্রী, ২৯ মে, ২০১৮

সম্পাদকীয় শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
বিতরণ শাখা, ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**

শিরোনামে

২০১৮-র স্কচ পুরস্কারে দেশের সেরা বাংলা ৭৬

কৃতীদের পাঠ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী
জীবন গড়তে পাশে থাকবে রাজ্য সরকার ৮২

উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী
কলকাতায় 'কন্যাশ্রী'-দের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ৮৪

দপ্তর কথা ৮৬

কথামুখ: নতুন রাজ্য সরকারের সাত বছর পূর্তি উপলক্ষে 'সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন' নামে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের তথ্যসম্বন্ধ প্রকাশনা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নিজের কলমে সেই প্রকাশনার কথামুখ পুনঃপ্রকাশিত হল এই সংখ্যায়। ৮৭

বঙ্গদর্শন ১০০

উত্তম-সন্ধ্যায় আবেগঘন মুখ্যমন্ত্রী ১০১

গুরুসদয় দত্ত ও তাঁর ব্রতচারী আন্দোলন ১০৫
ড. মনোজিৎ অধিকারী

তমলুক সংগ্রহশালা : বাংলার মা-মাটি-মানুষের সম্পদ ১২৪
ড. কমলকুমার কুণ্ডু

বাংলা মঙ্গলকাব্যে ইসলামি প্রসঙ্গ : ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ১৪৩
ড. রজতকিশোর দে

প্রসঙ্গ ছাতিনা কান্দী : রাজার দিঘির পাড়ের পটুয়া বসতি ১৫১
দীপাঞ্জন দে

স • ম্পা • দ • কী • য়

উন্নয়নের হাত ধরে উত্তরবঙ্গ

২০১১। রাজ্যে এল নতুন সরকার। উত্তরবঙ্গের পথ চলা শুরু হল উন্নয়নের হাত ধরে। তৈরি হল উত্তরকন্যা, নতুন সচিবালয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে গঠিত হল নতুন দপ্তর—উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে বড়ো জেলাকে ভেঙে ছোটো করা হল। তৈরি হল আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং জেলা। তৈরি হল মিরিক মহকুমা। উদ্দেশ্য, উত্তরবঙ্গের মানুষ যেন আরও বেশি করে প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারেন।

পাহাড়-তরাই-সমভূমি-সাগর এক ছন্দে উন্নয়নে দুলবে, এভাবেই গাওয়া হবে উন্নয়নের বৃন্দগান—মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভাবনা ক্রমে ক্রমে রূপ পেতে লাগল। নানা জনজাতির বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে উত্তরবঙ্গে একে একে আলাদা আলাদা বোর্ড গঠিত হল, নিজস্ব সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও বিকাশের কাজ শুরু হল নবউদ্যমে। উত্তরবঙ্গ হয়ে উঠল উন্নয়নের এক বর্ণময় কোলাজ।

উত্তরের সুন্দরী পাহাড় ও পাহাড়তলি তো সেই কবে থেকেই বিশ্ব পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয়। আবিষ্কৃত হল আরও অজস্র ভ্রমণবিন্দু, সেগুলি গড়ে তোলা হল নিপুণ যত্নে, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশ ও তদারকিতে। পর্যটনশিল্প প্রাধান্য পেল উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নে। উন্নত হচ্ছে পরিকাঠামো, জনজীবনের মান। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, পরিবহণ—পর্যটনের পাশাপাশি পাচ্ছে সমগুরুত্ব।

উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে কয়েকটি প্রতিবেদনের সঙ্গে এই সংখ্যায় কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হল।

লেখকের মতামত নিজস্ব। অনভিপ্রেত কোনও ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উত্তরবঙ্গ

উন্নয়নের উড়ানে

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'সার্বিক উন্নয়ন' শব্দবন্ধকে জীবন্ত করে তুললেন তাঁর কর্মপদ্ধতির সাফল্যে। রাজ্যের কোনও প্রান্তেই যেন 'অনুন্নয়ন' শব্দটা আর উচ্চারিত না হয় তারই জন্য উন্নয়নের জোয়ারের জল সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি।

পিছিয়ে থাকা 'উত্তরবঙ্গ' উন্নয়নে মমতা ব্যানার্জি দিলেন বিশেষ মনোযোগ। পরম যত্নে তিনি এই অঞ্চলের উন্নয়নের রূপরেখা গড়ে তুললেন।

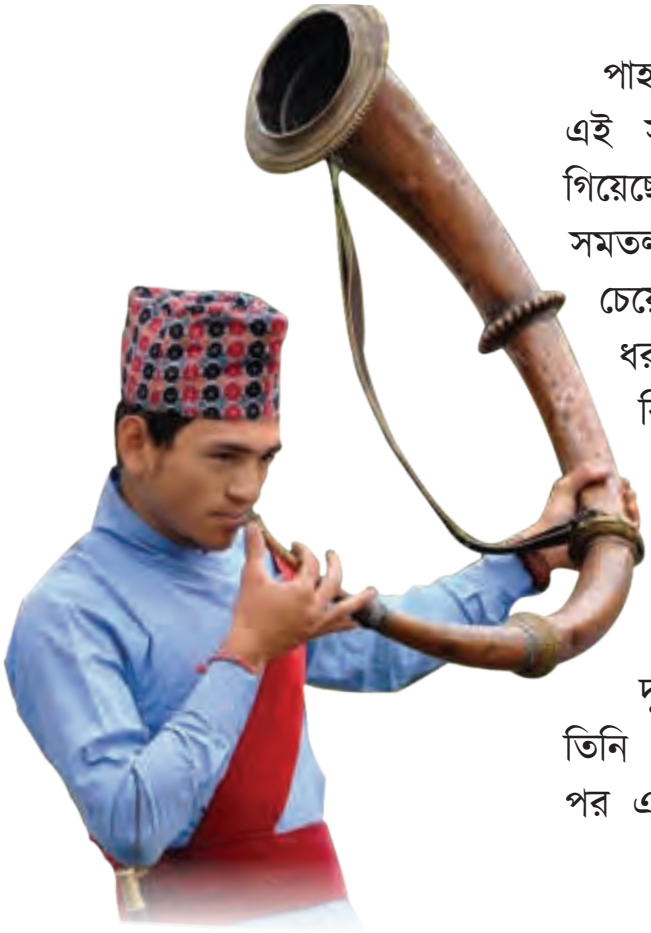

পাহাড়সুন্দরী দার্জিলিং তাঁর মন জুড়ে। এই সাতবছরে বারে বারে তিনি ছুটে গিয়েছেন ওখানে। পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স-সমতল-জঙ্গলমহল—এক ছন্দে জাগাতে চেয়েছেন। ঘোচাতে চেয়েছেন সব ধরনের অসাম্য। জোর দিয়েছেন বিভিন্ন জনজাতির জীবন-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণে। এই কাজে তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত। বলা যেতে পারে তুলনারহিত। পাহাড় নিয়ে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ দূরদর্শিতার নজির স্থাপন করেছে। তিনি পাহাড়-সমস্যার সমাধানে একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে চলেছেন।

পাহাড়বাসীর নানা সমস্যার সমাধানে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের জন্য নানা সরকারি পরিষেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে তাঁর সরকার। যা এর আগে ভাবা যেত না। তাঁদের মৌলিক চাহিদাপূরণে সরকারের এই পাশে থাকা তাঁদের মনের মধ্যে জমে থাকা 'বিচ্ছিন্নতাবোধ' ধীরে ধীরে দূর করে দিচ্ছে। সমতলের মানুষেরা যেসব সুযোগ-সুবিধার জন্য এগিয়ে যেতে পারত জীবনের সব ক্ষেত্রে, আজ তাঁদের পক্ষেও এইভাবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ঘরে ঘরে আলো, পানীয় জল, সুন্দর রাস্তা-ঘাট, শিক্ষার সুযোগ, প্রশিক্ষণের আয়োজন, স্বনির্ভরতার উদ্যোগে সামিল হওয়া— পাহাড়বাসীকে দিয়েছে স্বস্তিময় জীবনের স্বাদ।

তরাই-ডুয়ার্স-এর মানুষের জন্যও মুখ্যমন্ত্রীর একইরকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও উদ্যোগ।

চা-বাগানের মানুষদের জন্য তাঁর বিশেষ কর্মসূচি অব্যাহতভাবে চলছে। বন্ধ চা-বাগানগুলোর মানুষেরা যাতে অনাহারে না থাকেন তাঁর জন্য খাদ্য-সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি অপুষ্টি মোকাবিলার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়-তরাই-ডুয়ার্স জুড়ে পর্যটনের যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে সে কথা তো সকলেরই জানা। পর্যটন শিল্পে জোর দিয়ে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের ধারাতে গতি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

পর্যটনের সঙ্গে ওই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন গভীরভাবে যুক্ত।

তাই মুখ্যমন্ত্রী 'পর্যটন'-কেই ওখানে 'পাখির চোখ' করে রেখেছেন। পর্যটন শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে শান্তি ও সুস্থিতির ওপরে। পাহাড়ে লাগাতার অশান্তি ও ধর্মঘট এই শিল্পের পক্ষে মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর। মুখ্যমন্ত্রীর তাই সর্বদা নজর—ওই অঞ্চলের শান্তি অব্যাহত রাখা। কোনওরকম বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি যেন মাথা চাড়া না দেয়।

মূলস্রোতে ফিরল ৩৬ জন কেএলও সদস্য

তবু বারে বারেই দেখা যাচ্ছে, শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। শক্ত হাতে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে চলেছেন তিনি। শিকেড় থেকে উপড়ে ফেলতে চাইছেন বিচ্ছিন্নতাকামী মানসিকতাকে। সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ে তিনি পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন। জঙ্গি কার্যকলাপ রুখতে তিনি বদ্ধপরিকর। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের স্বাভাবিক কর্মজীবনই তাঁকে বিপথে যাওয়া থেকে বাঁচাবে। এই বিশ্বাসেই তিনি জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরিয়েছেন। তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন দায়িত্ব। একদিন যাঁরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন আজ তাঁরাই প্রশাসনের অংশ। এইভাবেই তিনি চরমপন্থী কার্যকলাপকে সরকারপন্থী কার্যকলাপে রূপান্তরিত করেছেন। সমাজের কল্যাণে লাগাচ্ছেন তাঁদের দক্ষতাকে। আজ এটি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও একটি 'মডেল' হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গ এখন অনেকটাই শান্তির বাতাবরণে উন্নয়নে মনোযোগী। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও তিনি এভাবেই দিশা দেখাচ্ছেন। একসময় যাঁরা জঙ্গি-কার্যকলাপের প্রশিক্ষণ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিচ্ছিন্নতাকামী কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছিলেন আজ তাঁরাই ফিরে আসতে চাইছেন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে। তাঁদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের সরকারি চাকরি দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে লাগাম টানা হচ্ছে জঙ্গিপনায়।

এই সরকারের মানবিক মুখ আমরা বারে বারেই দেখেছি। 'মানবিক মন' সমস্যার সমাধানে রাজ্যবাসীর আস্থাকে দৃঢ়তা দিচ্ছে।

গত ১২ জুলাই, বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যা-তে রাজ্য পুলিশের হোমগার্ড পদে ৩৬ জন কেএলও সদস্যের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্দেশ্য, তাঁদের সমাজের মূলস্রোতে সম্মানজনকভাবে বাঁচার সুযোগ তৈরি করা। মানুষ ভুল থেকেই শেখে—এই অভিমত প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আরও অনেকে আত্মসমর্পণের জন্য যোগাযোগ করেছেন বা যাঁরা করতে চান তাঁদের সকলকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার সুযোগ দিতে সরকার আগ্রহী।

মূলস্রোতে ফিরতে পারা কুমারগ্রামের মধুসূদন দাস, প্রমোদ দাস, মিহির দাস, অচিন্ত্যকুমার দাস, নিরঞ্জন দাস, বানেশ্বর দাস, শামুকতলার বিশ্বজিৎ অধিকারী, আলিপুরদুয়ারের অতুল রায়, সন্তোষ রায়েরা মূলস্রোতে ফেরার জন্য আবেদন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তাঁরা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় পুলিশের হোমগার্ডে চাকরি করবেন।

জীবনের এই স্বপ্নপূরণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন যেন তাঁরা। মিল্টন, টারজান—এইসব নাম বাংলা ও অসম পুলিশকে রাতের পর রাত বিনিদ্র রাখত। নিদ্রাহীন ছিল তাঁদের রাতগুলোও। এখন সব স্মৃতিমাত্র।

দুটি পাতা একটি কুঁড়ি

বাংলার চা-শিল্পের পুনরুজ্জীবনে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগী

রাজ্যের উত্তর জুড়ে স্বপ্ননীল পাহাড় আর সবুজ ধাপের চা-বাগিচা। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর ও কোচবিহারের অনেকটা জুড়ে চা-বাগান। মোট ২ লাখ ৭২ হাজার শ্রমিক চা-শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এই বাগানগুলিতে আরও ৮ লাখ অ-শ্রমিক রয়েছেন।

রাজ্যের অর্থনীতিতে চা-শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে কয়েক শতক ধরেই। কিন্তু বর্তমানে এই শিল্পের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠেছে। বেশ কয়েকটি বড়ো চা-বাগান দীর্ঘদিন বন্ধ। তারপর আছে টানা ধর্মঘট।

বন্ধ চা-বাগান নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকার মরিয়া। গত ১২ জুলাই, ২০১৮ তারিখে উত্তরকন্যায় এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চা-বাগান সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি জানানো হয় এই বৈঠকে। শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে নতুন আইন আনা ও ন্যূনতম ১৫৯ টাকা মজুরি দেওয়ার পাশাপাশি বন্ধ চা-বাগানগুলির সমস্যা মেটাতে বিকল্প ব্যবস্থা এবং স্থায়ী সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়া হয়েছে মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে যে কমিটির কাছে ৩ মাসেই রিপোর্ট চান মুখ্যমন্ত্রী।

নানা প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে সরকার চা-বাগানের সঙ্গে যুক্ত রাজ্যবাসীকে তাদের যথাসাধ্য সহায়তা করে চলেছে। কিন্তু এই সহায়তা তাঁদের কাছে যথেষ্ট নয়। ২০১১ সাল থেকে ১ হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থ চা-বাগানের শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা সত্ত্বেও। বন্ধ চা-বাগানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের পক্ষে জীবন-জীবিকার সংকট চরম সমস্যা তৈরি করছে। তাঁদের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী উদ্বিগ্ন। তিনি মালিকদের প্রতি তাঁর ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম ১৫৯ টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা এদিন জানানো হয়। মালিকদের সঙ্গে আলোচনার

ভিত্তিতে ওই মজুরি ১৭৬ টাকা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বন্ধ চা-বাগানের লিজ বাতিল করে ওগুলিকে নিলামে দেওয়ার কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পিএফ বিষয়ে আইন মোতাবেক মামলা করার কথাও বলেন তিনি। তিনি আরও বলেন যে বন্ধ চা-বাগানের জমিতে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে পাট্টা দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে এবং এইজন্য ভূমি-দপ্তরকে আইন করতে বলা হয়েছে।

এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিনয় তামাং, অনীত থাপা, মন ঘিসিং এবং চা-বাগানের সঙ্গে যুক্ত ৯টি শ্রমিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারা। রাজ্য সরকারের পক্ষে ছিলেন চার মন্ত্রী—মলয় ঘটক, অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন ও গৌতম দেব। এছাড়া ছিলেন মলয় দে, সুরজিৎ পুরকায়স্থ, ডিজি বীরেন্দ্র এবং দুই নেতা মোহন শর্মা ও দশরথ তিরকি।

বন্ধ চা-বাগানগুলিতে বিদ্যুৎ ও জলের ব্যবস্থার পাশাপাশি পরিবারপিছু ৪৭ টাকায় ৩৫ কেজি চাল দেয় রাজ্য সরকার। বন্ধ চা-বাগানের মধ্যে ৪টি খুব শীঘ্র খুলে যাওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্ধ চা-বাগানগুলিতে জনমুখী উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরুর কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। অ-শ্রমিকদের জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান এবং টি-টুরিজমের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশও দেন তিনি।

উত্তরবঙ্গে প্রশাসনিক সফরে মুখ্যমন্ত্রী

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর ফের উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লক্ষ্য উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ এবং প্রশাসনিক সভা। ৯ জুলাই তিনি পৌঁছন উত্তরবঙ্গে। এরপর উত্তরকন্যায় তিনটি এবং মেখলিগঞ্জে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। ফলে এখন পাহাড়-সমতল আরও বেশি ভাই-বোন। উত্তরের সমস্ত মানুষের জন্য আরও উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনা হল। প্রতিবারের মতো এবারও আরও বেশি মাত্রায় সমর্থন-শুভেচ্ছার ঢেউ উপচে পড়ল, মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে। তাঁদের উচ্ছ্বাস বুঝিয়ে দিল, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদেরই একজন। অবশ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরও ২৮-৩০ মে তিনি এসেছিলেন উত্তরবঙ্গ সফরে।

শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলাকে ঢেলে সাজার প্রকল্প নিল রাজ্য সরকার। বিশেষ করে, আলিপুরদুয়ার, জয়গাঁও ও কুমারগ্রামের উন্নতিতে আরও বেশি নজর দিতে নির্দেশ দেন তিনি। কুমারগ্রাম সীমান্তের বারোবিশার আলাদা পূর্ণাঙ্গ থানা করার বিষয়েও আলোচনা করা হয়। ৯ জুলাই, প্রশাসনিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের জন্য অপচয় কমাতে জোর দিন। বহু প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অনুদান বন্ধ। এর ফলে রাজ্য সরকারই অর্থ দিয়ে এইসব প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন অসম-ভুটান সীমান্ত শহর আলিপুরদুয়ারে নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঁশের ফাইবার থেকে যে শাড়ি তৈরি হচ্ছে, তার মার্কেটিং করতে হবে। গোলমরিচ, তেজপাতা, সুপারির চাষ বাড়াতে হবে।

১০ জুলাই চ্যাংড়াবান্ধায় এসে উন্নয়নের ঝুলি উজাড় করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানে সভা থেকে এমজেএন হাসপাতালে এমআরআই, শীতলকুচিতে নবনির্মিত দমকল কেন্দ্র, মাথাভাঙা-সিতাই-তুফানগঞ্জে নতুন থানা ভবন-সহ ১০টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন তিনি। পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়ায় ঘোষপুকুর কলেজ এবং নকশালবাড়ি হাতিঘিষা হিন্দি কলেজের উদ্‌বোধন করেন তিনি। স্বপ্নের পর্যটন প্রকল্প 'ভোরের আলো'-র কাজের অগ্রগতি নিয়েও খোঁজ নেন তিনি।

১১ জুলাই উত্তরকন্যায় চা-বাগান নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করার পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। ওদলাবাড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে হাসপাতালে উন্নীত করা হয়। উদ্‌বোধন হয় রাঙামাটি সাব-সেন্টার, মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সীমান্ত সমস্যা ও অসমের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

চ্যাংড়াবান্ধায় এসে উন্নয়নের ঝুলি উজাড় করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

সাত বছরে

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

লেখচিত্র
উপস্থাপনা

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার মতো উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে জনসাধারণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ২০১১ সালের ৮ জুলাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হয়। উত্তরবঙ্গে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের লক্ষ্য।

- **২০১১-এর মে থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ :**
  - **এক বছরেরও কম রেকর্ড সময়ে সময়ে জলপাইগুড়ির ফুলবাড়িতে সচিবালয়ের শাখা 'উত্তরকন্যা'** নির্মিত হয়েছে এবং মাননীয় **মুখ্যমন্ত্রী ২০১৪ সালের ২০ জানুয়ারি**এই শাখা সচিবালয়ের উদ্‌বোধন করেছেন।
  - **উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের** আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত ৩৬১টি চলমান প্রকল্প/পরিকল্প-এর কাজ সম্পূর্ণ করেছে এই বিভাগ।
- **রাস্তা ও সেতু :**
  - নিম্নবর্ণিত পরিকাঠামোগত পরিকল্পগুলির কাজ শেষ হয়েছে :
    - ✓ দার্জিলিঙের বিজনবাড়িতে বেইলি সেতু
    - ✓ চোপড়া ব্লকে ভাটনালা সেতু
    - ✓ গোয়ালপোখর-২ ব্লকে লাহিল এলাকায় সেতু
    - ✓ গোয়ালপোখর-২ ব্লকে পিটানি নদীর ওপর নেতারঘাট সেতু
    - ✓ উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে কাহালাই (চ্যানেল)-এ সেতু (পাইল ভিতের ওপর)
    - ✓ উত্তর দিনাজপুর জেলায় চূড়ামোহন-লালগঞ্জ, বাইতোলা-জয়হাট ও বারোদিঘিঘাট-লালগঞ্জ রাস্তা
    - ✓ ইস্টার্ন বাইপাস-সাহুডাঙ্গি-আমবারি ফালাকাটা-বেলাকোবা-গোসালা হয়ে শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত বিকল্প রাস্তা
    - ✓ সালুগারার খোলাচাঁদ ফাফরি গ্রামে সাহু নদীর উপর আরসিসি সেতু
    - ✓ সালুগারার ছোটো ফাফরি গ্রামে সাহু নদীর উপর আরসিসি সেতু
    - ✓ চোপড়ায় হাঁসখালি সেতু
    - ✓ ধূপগুড়িতে ঝুমুর নদীর উপর সেতু
    - ✓ ধূপগুড়িতে কালুয়া নদীর উপর সেতু
    - ✓ কোচবিহারের সালবারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মরা রায়ডাক নদীর উপর সেতু
    - ✓ পারহারিপুরে সুই নদীর উপর সেতু, কাচুয়া উচ্চ মাদ্রাসার কাছে গামারি নদীর উপর সেতু (শুধু সেতুর অংশ) এবং ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির জুগভিটায় সাহু নদীর উপর সেতু

- বিভাগ কর্তৃক গৃহীত রাস্তা সংক্রান্ত পরিকল্পগুলির বিস্তৃত বিবরণ নিম্নরূপ :

জেলা	সমাপ্ত						চালু					
	ঢালাই		পিচ		মোট		ঢালাই		পিচ		মোট	
	নং	কিমি	নং	কিমি	নং	কিমি	নং	কিমি	নং	কিমি	নং	কিমি
কোচবিহার	-	-	২৭	৫১.৯০	২৭	৫১.৯০	-	-	০৮	৩৯.৬৫	০৮	৩৯.৬৫
জলপাইগুড়ি	-	-	৬৮	১৬১.৬০	৬৮	১৬১.৬০	-	-	১৪	৩৫.৪৩	১৪	৩৫.৪৩
দার্জিলিং	৩	১.৬০	৩৬	৫৪.৬০	৩৯	৫৬.২০	-	-	০২	৫.০০	০২	৫.০০
উত্তর দিনাজপুর	১৬	৭.২০	১৪	৩৮.৬৫	৩০	৪৫.৮৫	-	-	১৬	৭৬.৫০	১৬	৭৬.৫০
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৫	১৩.৪০০	১৪	৫৮.৮২	২৯	৭২.২২	৩	১০.২৩	২১	৫৬.৭০	২৪	৬৬.৯৩
মালদা	৯	১৩.৪৭	২৯	৬৪.২৩	৩৮	৭৭.৭০	-	-	১৩	৩৭.০০	১৩	৩৭.০০
আলিপুরদুয়ার	-	-	-	-	-	-	-	-	০৫	১৩.৬৯	০৫	১৩.৬৯
মোট	৪৩	৩৫.৬৭	১৮৮	৪২৯.৮০	২৩১	৪৬৫.৪৭	৩	১০.২৩	৭৬	২৫৩.৯৮	৭৯	২৬৪.২১

* ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলার একটি অংশ ছিল।

- **শিক্ষা**
  - নিম্নবর্ণিত শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে
    - ✓ কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় (১ম পর্যায়)। ২য় পর্যায়ের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে
    - ✓ কোচবিহারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১ম পর্যায়)
    - ✓ কুমারগঞ্জ, কুশমণ্ডি, চোপড়া ও খড়িবাড়িতে ৪টি আইটিআই
    - ✓ ধূপগুড়ি, ঘোকসাডাঙা, নিশিগঞ্জ, বানারহাট (হিন্দি), মানিকচক, চোপড়া, কুমারগঞ্জ, নকশালবাড়ি (হিন্দি) এবং ঘোষপুকুরে ৯টি নতুন সরকারি কলেজ
    - ✓ রাজগঞ্জ কলেজ, দেওয়ানহাট কলেজ, বক্সিরহাট কলেজ ও এ পি সি রায় কলেজ সম্প্রসারণের কাজ
    - ✓ বীরপাড়ায় ফতেমা ও মেরি গরেথি বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজ
    - ✓ ফালাকাটায় লীলাবতী কলেজ, হলদিবাড়িতে নেতাজি সুভাষ কলেজ এবং আলিপুরদুয়ারে বীরপাড়া কলেজ মেরামতি, সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ

- **ক্রীড়া :**
  - নিম্নবর্ণিত পরিকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে
    - ✓ জলপাইগুড়িতে স্পোর্টস ভিলেজের উন্নীতকরণ। বর্তমানে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে
    - ✓ আলিপুরদুয়ারে ৫০০০ দর্শকাসন ইনডোর স্টেডিয়াম
    - ✓ কোচবিহারে এমজেএন স্টেডিয়াম ও মালদায় বৃন্দবাণী ক্রীড়াঙ্গনে ফ্লাড-লাইট এবং কমপাউন্ড লাইটিং-এর ব্যবস্থা
- **পর্যটন :**
  - নিম্নবর্ণিত পর্যটন প্রকল্পগুলির কাজ সমাপ্ত হয়েছে
    - ✓ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিঙের লামাহাটায় ২০১৩-র ২৯ জানুয়ারি টুরিজম হাব উদ্‌বোধন
    - ✓ কালিম্পঙে মরগান হাউস, হিলটপ ও তাশিডিং টুরিস্ট লজের মেরামতি ও সংস্কার
    - ✓ জলদাপাড়া ও মূর্তিতে তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা
    - ✓ আলিপুরদুয়ারে চিলাপাতা গ্রামের উন্নয়ন
    - ✓ কোচবিহারে দমদমা ঝিলের ধারে প্রকৃতি-পর্যটন (ইকো-টুরিজম) ও বনভোজন ক্ষেত্রের (পিকনিক স্পট) উন্নয়ন
    - ✓ আলিপুরদুয়ার প্যারেড মাঠের উন্নতিসাধন
    - ✓ শিলিগুড়িতে সূর্য সেন উদ্যানে টয় ট্রেনের জোগান ও স্থাপন
- **সাংস্কৃতিক :**
  - নিম্নবর্ণিত সাংস্কৃতিক প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হয়েছে :
    - ✓ রায়গঞ্জে রবীন্দ্রভবন সংস্কারের কাজ
    - ✓ জল্পেশ অতিথি নিবাসে নতুন তল ও সীমানা প্রাচীর
    - ✓ কোচবিহারের হলদিবাড়িতে একরামি আইসেল সাওয়ার মজাহরশরিফ (হুজুর সাহেব)-এর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

- ✓ শিলিগুড়িতে দীনবন্ধু মঞ্চের সংস্কার
- ✓ শিলিগুড়ির শক্তিগড়ে রবীন্দ্রভবন মেরামতির কাজ
- ✓ কোচবিহারে আধুনিক মানের প্রেক্ষাগৃহ
- ✓ দার্জিলিঙের মংপুতে রবীন্দ্রভবনের সংস্কার ও নির্মাণের কাজ পরিসমাপ্তির পথে

- **পরিকাঠামোগত উন্নয়ন :**
  - নিম্নবর্ণিত পরিকল্পগুলির কাজ সম্পন্ন হয়েছে :
    - ✓ ডাবগ্রামে শান্তিনগর ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন
    - ✓ নকশালবাড়ি হাতিঘিসায় বহু ব্যবস্থা সমন্বিত অসামরিক প্রতিরক্ষা কেন্দ্র (মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সিভিল ডিফেন্স সেন্টার)-এর নির্মাণ কাজ। এটিকে অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
    - ✓ মালদায় কেন্দ্রীয় বাস টারমিনাস
    - ✓ দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে মার্কেট কমপ্লেক্স (১ম পর্যায়)
    - ✓ গারিধুরা পুলিশ ফাঁড়ি ও সুখিয়াপোখরি থানার ভবন নির্মাণ
    - ✓ রিচমন্ড হিল (পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন)-এর বিশেষ মেরামতি ও সংস্কার
    - ✓ ডিএসপি ট্রাফিক ও পুলিশ ফোর্স বারাকের জন্য ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগরে দ্বিতল ভবন
    - ✓ সুকনা বন বিশ্রামাগারে বিশেষ মেরামতি ও সংস্কার-সহ অন্যান্য কাজ এবং ইলেকট্রিক ইনস্টলেশন-এর কাজ
    - ✓ মাটিগাড়ার হিমাঞ্চল বিহারে (২য় পর্যায়ে) জি+ ৫ তল অতিথি নিবাস
    - ✓ হরিরামপুর (মার্কেট কমপ্লেক্স-সহ) ও বুনিয়াদপুরে বাস টারমিনাস
    - ✓ কোচবিহার জেলায় ১১টি হাটের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন

- **পানীয় জল সরবরাহ পরিকল্প :**
  - নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলির কাজ পরিসমাপ্ত
    - ✓ নকশালবাড়ি ব্লকের অধীনে কিলারাম, কেতুগাবুর, বড় মুনিরাম সুরজবার, সৌবার, ছোটো মুনিরাম (আংশিক) এবং এর সংলগ্ন মৌজাগুলিতে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল সরবরাহ প্রকল্প

- ✓ খড়িবাড়ি ব্লকের অধীনে বুধসিং মৌজা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় জল সরবরাহ পরিকল্প
- ✓ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অধীনে ফৌদিগাছ মৌজা ও সংলগ্ন অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল সরবরাহ পরিকল্প
- ✓ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অধীনে ভিসটি মৌজা, ভুবনগুড়ির চট, চৌপুকুরিয়া, ডালুর চট ও হালাল-এ জল সরবরাহ প্রকল্প
- ✓ ফালাকাটা ব্লকের অধীনে বংশীধরপুর, কালিপুর, কাদম্বিনী চা বাগান ও রাইচেঙ্গায় জল সরবরাহ পরিকল্প
- ✓ বক্সা দুর্গ এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল সরবরাহ পরিকল্প
- ✓ জলপাইগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাম্প-সহ ৩টি গভীর নলকূপ এবং প্লামিং মেশিন-সহ পাম্প হাউজ স্থাপন
- ✓ জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৩, ১৪ ও ২০ নং ওয়ার্ডে ৩টি লৌহ নিষ্কাশন প্ল্যান্ট স্থাপন

- **সেচ ও নদী বাঁধ সংরক্ষণের কাজ :**
  - নিম্নলিখিত পরিকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে
    - ✓ জলপাইগুড়ির গদাধর চ্যানেলের নিকাশি ক্ষমতা উন্নত করা হয়েছে
    - ✓ জলপাইগুড়ি জেলায় (ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা ও রাজগঞ্জ ব্লকে) ১১টি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় (কুমারগ্রাম ব্লকে) ১টি নদী পাড় সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ
    - ✓ কোচবিহার জেলায় (দিনহাটা-১, তুফানগঞ্জ ১ ও ২, সিতাই, কোচবিহার ১ ও ২ ব্লকে) ১৩টি নদী পাড় সংরক্ষণ প্রকল্পের কাজ
    - ✓ দার্জিলিং জেলায় (মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া ব্লকে) ৭টি নদী পাড় সংরক্ষণের কাজ

- **স্বাস্থ্য :**
    - উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা হাসপাতালে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগকে ১০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ :

হাসপাতালের নাম	যন্ত্রপাতির নাম	পরিমাণ
শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল	ফিটাল ডপলার	০৪
	রেডিয়্যান্ট ওয়ার্মার	০৪
	ফটোথেরাপি ইউনিট	০৪
	পাল্‌স অক্সিমিটার	১০
	ইনস্ট্রুমেন্ট স্টেরিলাইজার (এস)	২০
	ইনস্ট্রুমেন্ট স্টেরিলাইজার (এম)	২০
	বেড সাইড পেশেন্ট মনিটরিং	১০
	ভেন্টিলেটর (পেড)	০২
	সিরিঞ্জ পাম্প	১০
	সি আর্ম লো এন্ড	০১
	ডায়ালিসিস সাভির্সেস কমপ্লিট সেট আপ	০১
	অক্সিজেন কনসেনট্রেটর	১০
দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল	সিরিঞ্জ পাম্প	০৩
	ইনফিউশন পাম্প	০২
	সি আর্ম লো এন্ড	০১
	ডায়ালিসিস সার্ভিসেস কমপ্লিট সেট আপ	০১
কালিম্পং মহকুমা হাসপাতাল	সি টি স্ক্যান	০১
	ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন (সি আর)	০১
	পাল্‌স অক্সিমিটার	০৪
	বেড সাইড পেশেন্ট মনিটরিং	০৪
	সি আর্ম লো এন্ড	০১
আলিপুরদুয়ার মহকুমা হাসপাতাল	সি আর্ম লো এন্ড	০১
মাল মহকুমা হাসপাতাল	সি আর্ম লো এন্ড	০১

চিত্রপঞ্জি

১

২

৩

৪

৫

১ আমবাড়ি ফালাকাটা রোড

২ বেইলি ব্রিজ, বিজনবাড়ি, দার্জিলিং

৩ বৈরাগীদিঘি লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, কোচবিহার

৪ করলা নদীর সৌন্দর্যায়ন

৫ আলিপুরদুয়ারে ডিমা নদীর উপর সেতু

৬

৭

৮

৯

১০

৬ উত্তর দিনাজপুরের সুই নদীর উপর সেতু

৭ জলপাইগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস

৮ কোচবিহারে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

৯ হাতিঘিসায় মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সিভিল ডিফেন্স সেন্টার

১০ কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ পর্যটনের অনন্য আকর্ষণ

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বেঙ্গল সাফারি

উত্তরবঙ্গ সফরে চলেছেন? একদিকে সবুজের হাতছানি, অন্যদিকে নানা ধরনের প্রাণীর সঙ্গে কাটানোর অনাবিল আনন্দ—চোখের নিমেষে কেটে যাবে গোটা একটা দিন। জীব বৈচিত্র্যের এক অপূর্ব সম্ভার শিলিগুড়ির এই মহানন্দার তীরে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সাফারি পার্ক।

ছবি: অশোক মজুমদার
তথ্য সৌজন্য: বেঙ্গল সাফারি

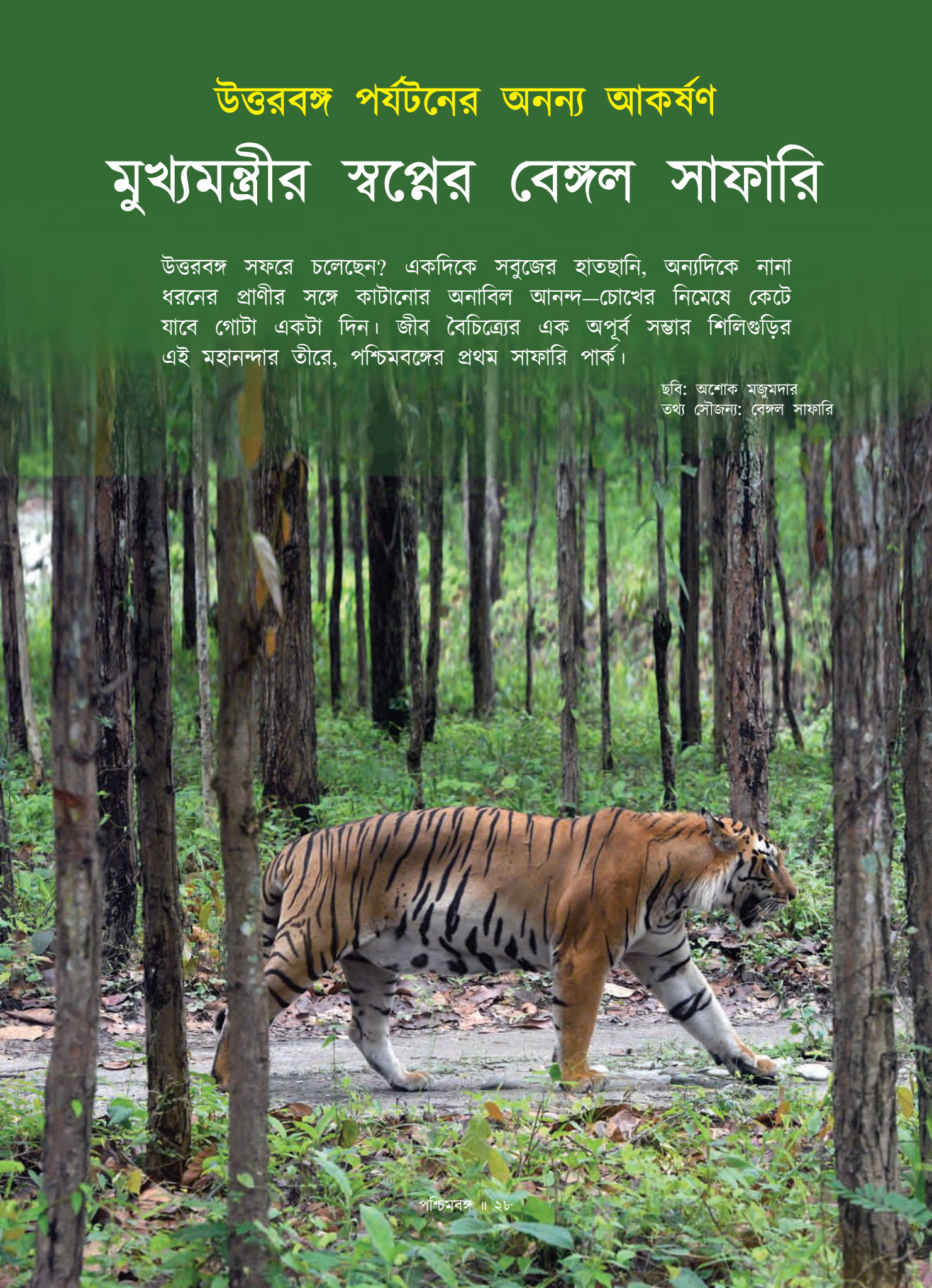

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের সাফারি পার্ক আজ উত্তরবঙ্গ পর্যটনের অনন্য আকর্ষণ। কোথাও হাতির পিঠে চেপে—কোথাও লেপার্ড বা বাঘের খাঁচার সামনে! জঙ্গলের এক অদ্ভুত নেশা যেন আজ টেনে ধরছে গোটা দেশের পর্যটকদের। সাফারি বাসে ঘুরে নেওয়া যায় টাইগার সাফারি, লেপার্ড সাফারি, কুমির প্রকল্প। এশিয়ার কৃষ্ণ ভল্লুক বা ফিশিং ক্যাট শুধু নয়— দেখা মিলবে নানা ধরনের পাখিরও। এদের অনেকেই আজ আবার বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির তালিকায়।

যোগাযোগ—

নর্থ বেঙ্গল ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস পার্ক

Email ID-dirnbwap@gmail.com

http://www.northbengalwildanimalspark.in

ফোন: +91353-2643900

ফ্যাক্স: +91353-2643901

টিকিট বুকিং অনলাইন ও মোবাইল অ্যাপস-এ।

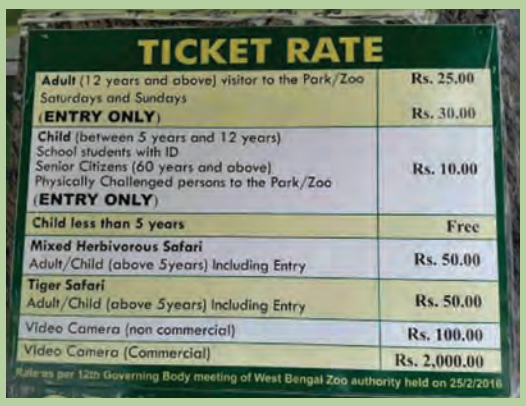

২১ জানুয়ার, ২০১৬। বেঙ্গল সাফারি পার্কের উদ্‌বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

২০১৬-র জানুয়ারি মাসেই এখানে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১ জানুয়ারি উদ্‌বোধন করেন বেঙ্গল সাফারি পার্কের। ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে ঘড়িয়ালদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলাদা জায়গা-সহ বহু প্রকল্প। ঠিক এক বছর পর ২০১৭-র ২২ জানুয়ারি ফের আসেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্‌বোধন করেন টাইগার সাফারি, প্রশাসনিক ভবন, পশুপাখিদের চিকিৎসার হাসপাতাল, স্টোর, রান্নাঘর এবং ক্যাফেটেরিয়া। ২০১৮-র ১ জুলাই পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব এবং বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন লেপার্ড সাফারি এবং কুমির প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন।

লেপার্ড

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি বনভূমি এবং বন্যপ্রাণীতে সমৃদ্ধ। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের এই সাফারি পার্কে প্রতিপালিত হয় নানা ধরনের বন্য প্রাণী যেমন-বাঘ, চিতা, হাতি, একশৃঙ্গ গন্ডার, হিমালয়ের কালো ভল্লুক, চিতল ও সম্বর হরিণ, কুমির এবং বহু প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় পাখি।

সংখ্যার ভিত্তিতে কলকাতার পরেই শিলিগুড়ির স্থান। সমগ্র উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ শহর শিলিগুড়ি। পর্যটকদের সিকিম, ভুটান, উত্তর-পূর্ব ভারত বা পূর্ব নেপাল যেতে হলে শিলিগুড়ি ছুঁয়ে যেতেই হবে। শিলিগুড়ি শহরটি রেলপথ, সড়ক পথ এবং আকাশ পথে কলকাতা এবং দিল্লির সঙ্গে যুক্ত।

এই অঞ্চলের বন্যপ্রাণীদের বাংলার মানুষ এবং পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়ে শিলিগুড়ি 'বেঙ্গল সাফারি' তৈরি হয়েছে। CENTRAL ZOO AUTHORITY-র রীতি-নীতি এবং মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সাফারি পার্কের সমস্ত আইনি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বেঙ্গল সাফারি পার্কটি ২৯৭ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। পার্কটি শাল, সেগুন, শিমূল গাছে সমৃদ্ধ। এই পার্কটিতে চারটি বড় সাফারি রয়েছে। যেমন- (১) তৃণভোজী প্রাণীদের সাফারি (91HA), (২) ব্যাঘ্র সাফারি (20HA), (৩) চিতা সাফারি (20HA) এবং (৪) কালো ভল্লুক সাফারি (20HA)।

পর্যটকদের এই সাফারি ভ্রমণের জন্য বিশেষভাবে তৈরি যানবাহনের ব্যবস্থা আছে।

পার্কে বিশাল বেষ্টনীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বন্য বিড়াল, কুমির, ঘরিয়াল-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পাখি দেখা যায়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ২০১৪ সালের ১৭ জুলাই এই পার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ডাবগ্রাম ব্লকে, বর্তমানে এই সাফারি পার্কের আয়তন ২৯৭ হেক্টর।

দেড় বছর পর, তৃণভোজী প্রাণীদের সাফারি তৈরি করে, উদ্‌বোধন করা হয় বেঙ্গল সাফারি পার্কের।

কী করবেন:

- বৈধ প্রবেশপত্র নিয়ে তবেই পার্কে প্রবেশ করুন। এবং পার্কের এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রবেশপত্র বা টিকিটটি যত্ন করে রাখুন।
- যানবাহন নির্দিষ্ট স্থানেই রাখুন।
- পার্কে শান্তি এবং নীরবতা পালন করুন।
- পার্ক পরিষ্কার রাখতে ডাস্টবিন ব্যবহার করুন।
- অন্যান্য ভ্রমণকারীদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন।
- কোনও সন্দেহজনক ঘটনা তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষকে জানান।
- দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্টকৃত স্থানেই থাকুন।
- জল সংরক্ষণ করুন।

কী করবেন না:

- পার্কের কোনও পশুকে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।
- পশুদের উত্ত্যক্ত করবেন না।
- পার্কের ভিতরে কোনও প্লাস্টিকের বোতল, পলিব্যাগ বা খাবার নিয়ে প্রবেশ করবেন না।
- পার্কের ভিতরে কোনও বাদ্যযন্ত্র বা অডিও সিস্টেম বাজাবেন না।
- কোনও খেলার সামগ্রী যেমন ফুটবল ইত্যাদি নিয়ে পার্কে প্রবেশ করবেন না।
- কোনও পোষ্য প্রাণী যেমন-কুকুর বা বিড়াল নিয়ে পার্কে প্রবেশ করবেন না।
- কোনও দাহ্যবস্তু পার্কে আনবেন না।
- পার্কে আবর্জনা ফেলবেন না।
- সাফারি বাসের জানালার কাচ খুলবেন না।
- বন্যপ্রাণীদের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন না।
- পার্কে কর্মরত ব্যক্তিদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।
- পার্কে মদ্যপান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

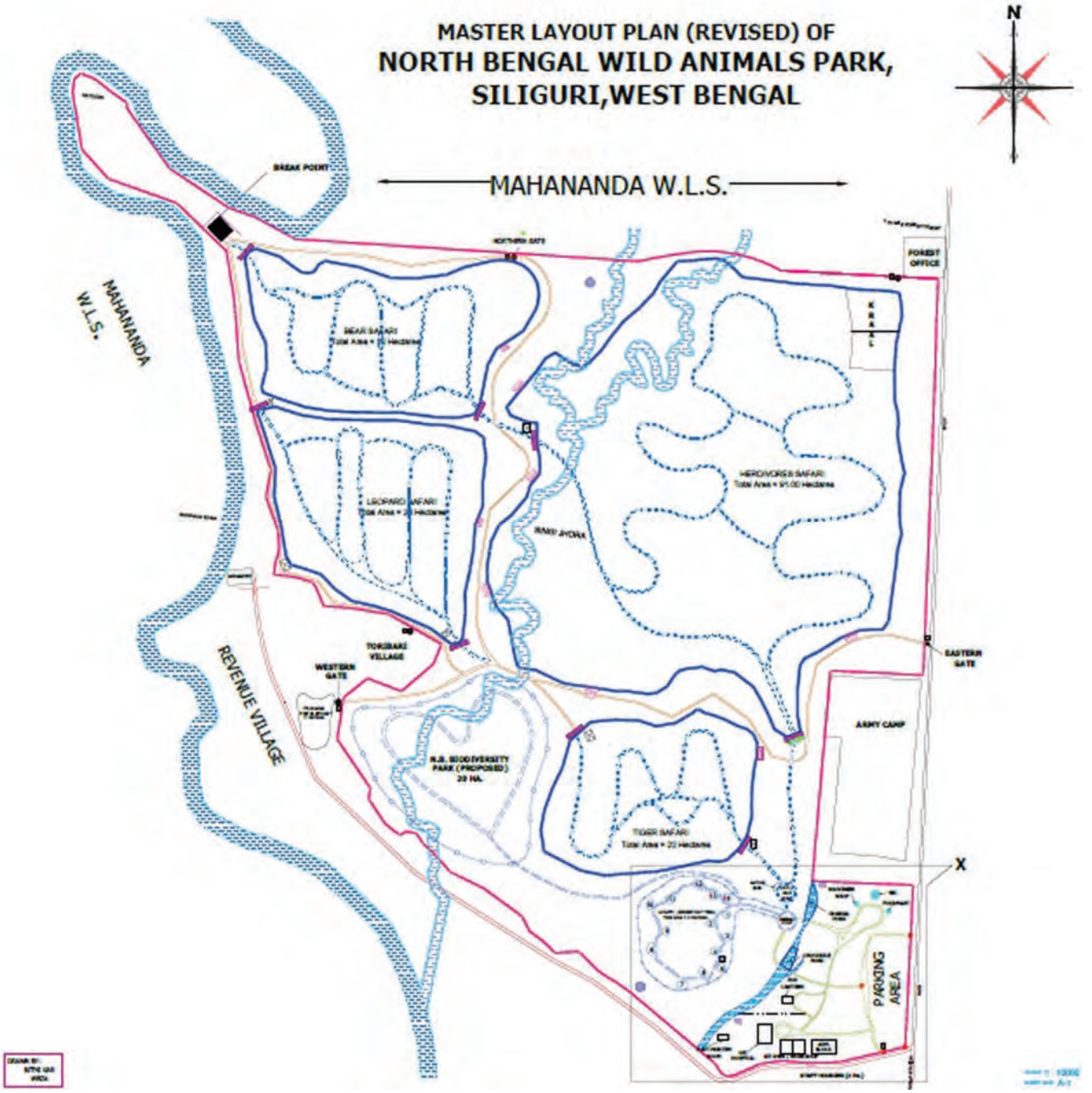

অবস্থান:

এই পার্কটি ৫ মাইল, সেবক রোড, সালুগাড়া, ভক্তিনগর থানায় অবস্থিত। জেলা জলপাইগুড়ি। পার্কটি শিলিগুড়ি শহর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার এবং বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

প্রকল্পের অধীন সুবিধাগুলি:

- প্রবেশ দ্বার
- যানবাহন রাখার সুব্যবস্থা
- টিকিট কাউন্টার
- চা/কফি কিয়স্ক
- ভেষজ উদ্ভিদের বাগান
- পশু হাসপাতাল
- সীমানা প্রাচীর
- প্রশাসনিক ব্লক
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- কর্মী আবাসন

উদ্দেশ্য:

- পর্যটকদের এই অঞ্চলের বন্যপ্রাণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রদান করা।
- এই অঞ্চলের বৈচিত্রময় জীবকুলকে সকলের সামনে তুলে ধরা।
- উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্সের সংরক্ষিত অঞ্চলগুলির উপর থেকে চাপ কমানো।
- উত্তরবঙ্গের লুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীগুলির সংরক্ষণ এবং বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করা।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা।

বিষয়সমূহ:

বন্যপ্রাণীদের প্রদর্শনী বন্য পরিবেশে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

- মিশ্র তৃণভোজী সাফারি
- ব্যাঘ্র সাফারি
- ব্ল্যাক বিয়ার সাফারি
- লেপার্ড সাফারি
- পাখি ট্রেল
- স্মল ক্যাটস ট্রেল
- সরীসৃপ (ঘরিয়াল, কুমির) পুষ্করিণী
- জীব বৈচিত্র পার্ক

প্রদেয় সুবিধা:

- মিশ্র তৃণভোজী সাফারি। (ছোট AC বাসে ভ্রমণের সুবিধা)।
- পক্ষী নিবাস ভ্রমণ। (পায়ে হেঁটে)
- ঘরিয়াল (পায়ে হেঁটে)

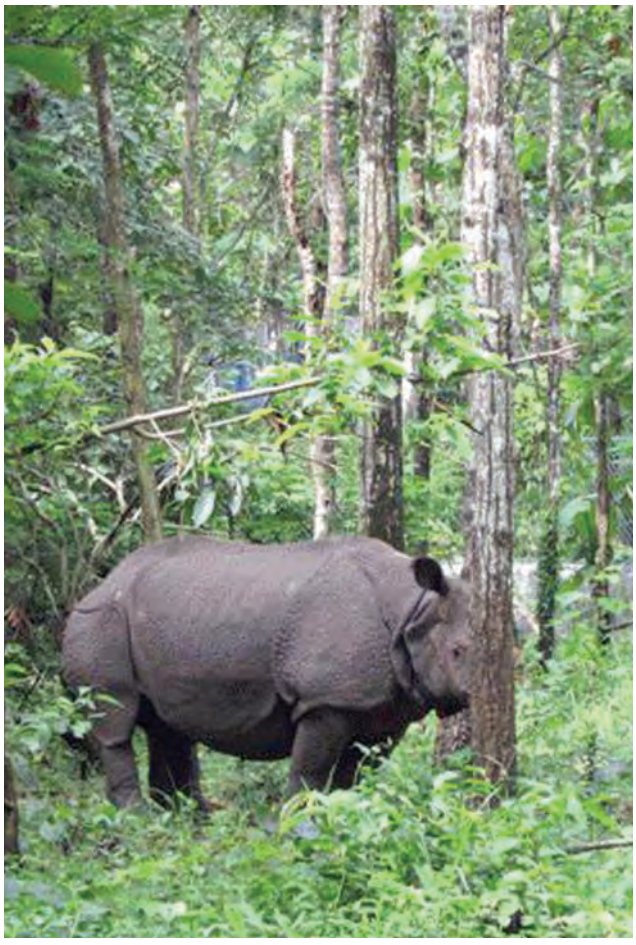

প্রবেশ মূল্য:

- চিড়িয়াখানার জন্য (প্রাপ্ত বয়স্ক) ৩০ টাকা (শনি, রবিবার ও ছুটির দিন), ২৫ টাকা (অন্যান্য দিন),
- চিরিয়াখানার জন্য ১০ টাকা (শিশু, বরিষ্ঠ নাগরিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য)
- মিশ্র তৃণভোজী সাফারি ৫০ টাকা (জন প্রতি)
- ভিডিও ১০০ টাকা (প্রতি ঘণ্টা)

যানবাহনের জন্য:

- তিন চাকার গাড়ি বা হালকা গাড়ির জন্য ২ ঘণ্টায় ৩০ টাকা। অতিরিক্ত সময়ের জন্য ১০ টাকা প্রতি ঘণ্টা।
- বাস ১০০ টাকা প্রতি ২ ঘণ্টা। অতিরিক্ত প্রতি ঘণ্টা ৫০ টাকা।
- বাইক বা স্কুটার ১০ টাকা, প্রতি ২ ঘণ্টা। অতিরিক্ত ৫ টাকা প্রতি ঘণ্টা।
- সাইকেল ৫ টাকা, প্রতি ২ ঘণ্টা। অতিরিক্ত প্রতি ঘণ্টা ২ টাকা।

সময় সূচি:

- টিকিট সংগ্রহের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত।
- ভ্রমণ করবার সময়—সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। সোমবার পূর্ণদিবস দর্শনার্থীদের জন্য পার্ক বন্ধ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অরুণ মুখোপাধ্যায় জানালেন, অনেকটা ওড়িশার নন্দনকাননের ধাঁচে এই সাফারি পার্ক। কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার মতো এখানেও প্রাণী দত্তকের নেওয়ার সুবিধা রয়েছে।

প্রাণী দত্তকের অর্থমূল্য তালিকা*

প্রাণীর নাম	অর্থমূল্য
বাঘ/হাতি	২ লক্ষ টাকা
গণ্ডার/লেপার্ড	১ লক্ষ টাকা
গাউর (ভারতীয় বাইসন) এবং অন্যান্য বড় তৃণভোজী প্রাণী	৭৫ হাজার টাকা
ঘরিয়াল/কুমির/কৃষ্ণ ভল্লুক	৫০ হাজার টাকা
ছোটো মাংসাশী প্রাণী (জাঙ্গল ক্যাট/ফিশিং ক্যাট) এবং রঙিন পাখি ফিজ্যান্ট	৩০ হাজার টাকা
অন্যান্য পাখি, হরিণ জাতীয় ছোটো তৃণভোজী, কচ্ছপ ও তালিকা বহির্ভূত অন্যান্য প্রাণী	২৫ হাজার টাকা

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। যোগাযোগ: সাফারি পার্ক, শিলিগুড়ি

সাফারি পার্কের কিছু জীববৈচিত্র:

সাফারি পার্কের তৃণভোজী পরিবারের একটি বড় অংশ হল হরিণ। পুরুষ হরিণের মাথায় শৃঙ্গ থাকে এবং মাথায় শৃঙ্গ প্রতি বছর গজিয়ে ওঠে। এই শৃঙ্গ একবার ঝরে গেলেও আবার গজিয়ে ওঠে। মিলন ঋতুর সময় পুরুষ হরিণেরা শৃঙ্গের দ্বারা বীরত্ব দেখিয়ে স্ত্রী হরিণদের আকৃষ্ট করে।

বহু বছর ধরে হরিণ প্রজাতিদের শিকার করা হচ্ছে।

বড় পুরুষ হরিণদের 'স্ট্যাগ' (STAG), স্ত্রী হরিণদের 'ডো' (DOE) এবং বাচ্চা হরিণদের 'ফন' (FAWN) বলা হয়।

পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য হরিণদের পা খুব লম্বা হয়। ফলে এরা লাফাতে এবং সাঁতারেও পটু হয়। হরিণদের জন্মের পর শরীরে সাদা দাগ দেখা যায়। কিন্তু এক বছরের মধ্যে সেই দাগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চা হরিণ তাদের মায়ের সাথে এক বছর থাকে। সাফারিতে তিন প্রজাতির হরিণ দেখা যায়।

চিতল হরিণ:

চিতল হরিণদের সাধারণত ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় পাওয়া যায়। চিতল হরিণরা লম্বায় ১-১.৫ মিটার, লেজগুলি লম্বায় ১০-২৫ সেমি এবং ওজনে ৭০-৭৯ কেজি হয়। এদের শরীরের রং লালচে হয় এবং শরীরে সাদা দাগ দেখা যায়। পুরুষ হরিণদের মাথায় শৃঙ্গ দেখা যায়। চিতল হরিণরা সাধারণত সকাল, বিকাল এবং রাতে সক্রিয় থাকে। এরা তৃণভোজী প্রাণী। তাই এদের প্রধান খাদ্য ঘাস এবং অন্যান্য সবুজ গাছপালা। সারা বছর ধরে এরা প্রজনন ঘটায়। এদের গর্ভধারণের সময় ২১০-২২৫ দিন। গর্ভধারণের পর এরা সাধারণত একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। এদের বয়স যখন ১২-১৪ মাস হয় তখন এরা প্রজনন করার জন্য তৈরি হয়ে ওঠে। বাঘ এবং চিতা বাঘ প্রধাণত এদের শত্রু হয়। জঙ্গলে এরা ৯ থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং বন্দিদশায় ১৮ থেকে ২২ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

সম্বর হরিণ:

সম্বর হরিণরা সাধারণত প্রচুর ঘন জঙ্গলে বাস করে। সম্বর হরিণরা লম্বায় ৫.৩ থেকে ৮.৯ ফুট উচ্চতায় ৪০ থেকে ৬৩ ইঞ্চি এবং ওজনে ২২০ থেকে ১২০০ পাউন্ড হয়। এদের শরীরের রং বাদামি হয়। শৃঙ্গ ৪০ ইঞ্চি লম্বা হয়। এরা সাধারণত ভোর, বিকাল এবং রাতে সক্রিয় থাকে। এদের প্রধান খাদ্য ঘাস, বাঁশপাতা এবং ফল। সাধারণত দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে একা পাওয়া যায়। সাধারণত সারাবছর ধরে এরা প্রজনন ঘটায়। কিন্তু এরা সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারিতে প্রজনন ঘটাতে বেশি পছন্দ করে। এদের গর্ভধারণের সময় ৮ মাস থেকে ৯ মাস। গর্ভধারণের পর এরা একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। জঙ্গলে এরা সাধারণত ২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে আর বন্দিদশা অবস্থায় ২৬ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

বার্কিং হরিণ:

বাকিং হরিণরা সাধারণত ঘন জঙ্গলে বসবাস করে। এই হরিণরা লম্বায় ৩১.৫ থেকে ৩৯ ইঞ্চি এবং ওজনে ২৪ থেকে ৩৫ পাউন্ড হয়। এদের শরীরের রং লালচে বাদামি হয়। গলায় এবং লেজে সাদা লোমের প্যাঁচ দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ হরিণদের শৃঙ্গ ছোট হয়, স্ত্রী হরিণদের শৃঙ্গ থাকে না। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় হরিণের শ্বাদন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত ভোরবেলা, বিকালবেলা এবং রাতে সক্রিয় থাকে। এদের প্রধান খাদ্য পাতা, ফুল, বীজ ও ছত্রাক। প্রজনন ও বিপদকালীন সতর্ক বার্তা হিসাবে এরা চিৎকার করে সংকেত দেয়। তাই এদের বার্কিং হরিণ নামে ডাকা হয়। এরা একা থাকতে পছন্দ করে এবং লাজুক প্রকৃতির হয়। এদের জানুযারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যেই বেশিরভাগ প্রজনন হয়। কিন্তু সারা বছর এদের প্রজনন ঘটে। গর্ভধারণের সময় ৭ মাস এবং গর্ভধারণের পর এরা একটি বাচ্চা প্রসব করে। এদের বয়স যখন ৬ মাস থেকে ১২ মাস তখন এরা প্রজনন করার জন্য তৈরি হয়ে ওঠে। এরা জঙ্গলে সাধারণত ১৭ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

স্কারলেট ম্যাকাও:

স্কারলেট ম্যাকাও একটি বড়, খুব রঙিন প্যারট যা আমাজন রেন ফরেস্টের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র পরিবেশে বসবাস করে।

খাদ্য: বড় ও কঠিন বীজ-সহ ফল এবং বীজ।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1)

নীল এবং হলুদ ম্যাকাও:

নীল এবং হলুদ ম্যাকাও, যা নীল এবং সোনা মাকু নামেও পরিচিত। নীল এবং হলুদ ম্যাকাও প্রায়ই অন্য পাখির প্রশিক্ষক এবং সেজন্য এদের বুদ্ধিমান পাখি বলে মনে করা হয়। নীল এবং হলুদ ম্যাকাও সমস্ত প্যারট প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে করা হয়।

খাদ্য: পাম ফল এবং অন্যান্য গাছের ফল। ম্যাকাও-এর প্রিয় খাবারগুলির মধ্যে একটি হল হুরাকোপিট্যান্স গাছের বীজ।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1)

আফ্রিকার ধূসর প্যারট:

আফ্রিকার ধূসর প্যারটটির দেহের বেশিরভাগ অংশে একটি ধূসর আস্তরণ থাকে। তবে লেজের পালক রঙিন হয়। আফ্রিকার ধূসর প্যারট প্রায় ৪৫০ গ্রাম ওজনের হয়।

খাদ্য: বীজ, বাদাম, ফল এবং শস্য এদের খাদ্য। পাম গাছের বাদাম এদের খুব পছন্দের খাবার।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1)

হলুদ মস্তক টিয়া:

এই প্রজাতি রিপেরিয়ান বন এবং আশেপাশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জঙ্গল এলাকায়, পাশাপাশি বেলিজের চিরস্থায়ী বন এবং গুয়াতেমালা ম্যানগ্রোভ-এ পাওয়া যায়। এছাড়াও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ইম্পেরিয়াল বিচ, সান্তা এমা, লোমা লিন্ডা ও পাসডেনায় এই প্রজাতির পাখিদের দেখতে পাওয়া যায়।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1)

রোজ-ব্রেস্টেড কাকাতুয়া:

রোজ-ব্রেস্টেড কাকাতুয়ার বুক, পেট এবং মুখের নীচের অর্ধে উজ্জ্বল গোলাপি পালক রয়েছে। তাদের গোলাপি-সাদা বুক এবং ধূসর পিঠ, ডানা ও লেজে পালক আছে। ধূসর পা এবং শিং-এর রঙের ঠোঁট।

খাদ্য: সবুজ মটরশুটি এবং বিভিন্ন শাক-সব্জি। এছাড়া আখরোট, বাদাম।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1)

সালফার ঝুঁটিওয়ালা কাকাতুয়া:

সালফার ঝুঁটিওয়ালা কাকাতুয়া একটি অপেক্ষাকৃত বড় সাদা কাকাতুয়া। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ গিনি এবং বনভূমি অঞ্চলে এদের দেখতে পাওয়া যায় এছাড়া ইন্দোনেশিয়ার কিছু দ্বীপেও এদের পাওয়া যায়। এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান পাখি। যদিও এদের পোষ্য হিসেবে দাবি করা যেতে পারে।

খাদ্য: বিভিন্ন বীজ, বাদাম ও ফল, যেমন পেঁপে, শুকনো ফল ও সব্জি।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1)

সাদা কাকাতুয়া:

সাদা কাকাতুয়া, ছাতা কাকাতুয়া নামেও পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি-সহ ক্রান্তীয় রেনফরেস্টে মাঝারি আকারে কাকাতুয়া দেখা যায়। এদের মাথার ওপর বড় পালকের ছাতার মতো অংশ থাকে যা একটি অর্ধবৃত্তাকার আকৃতির মতো দেখতে (ছাতার অনুরূপ, অতএব বিকল্প নাম)। ডানা এবং পুচ্ছ হলুদ বা লেবুর রংয়ের হয় এবং ওড়ার সময় তা দেখা যায়।

খাদ্য : এরা বীজ, বাদাম, ফল, শিকড় এবং কীট-পতঙ্গ, পোকা লার্ভা খেয়ে থাকে।

সংরক্ষণ : বিপন্ন (IUCN 3.1)

বদ্রি:

বদ্রি সাধারণ পোষা টিয়া বা শেল টিয়া নামেও পরিচিত। এটি আকারে ছোট এবং লম্বা লেজ বিশিষ্ট হয়।

খাদ্য: ফল ও শাক-সবজি যেমন আপেল, কুমড়া, আঙুর, আম, মিষ্টি আলু, স্কোয়াশ।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1)

মদনটাক:

মদনটাক একটি বড় পাখি যা CICONIIDAE পরিবারের হয়। এরা এই প্রজাতির জিনের অন্যান্য সদস্যদের মতো, এদের খাড়া ঘাড় এবং মাথা আছে। তবে এটি জলাভূমি অধিবাসীদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জাভা এবং ভারতেও এদের পাওয়া যায়।

খাদ্য: শিকারের সন্ধানে এরা জলাশয়ের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পঙ্গপাল ইত্যাদি এদের খাদ্য।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1), SCHEDULE IV (WPA, 1972)

গোলাপী রিং-নেক্ড টিয়া :

গোলাপী রিং-নেক্ড টিয়া এবং রিংনেক্ড টিয়া নামেও পরিচিত, মূলত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আফ্রিকা-এশিয়ার অত্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এদের বাস।

খাদ্য: কুঁড়ি, ফল, সবজি, বাদাম এবং বীজ। বন্দি অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করে এবং প্রোটিনের জন্য বেশ কিছু ফল, সবজি, বীজ এবং এমনকী অল্প পরিমাণে রান্না করা মাংস খেতে পারে।

সংরক্ষণ: বিপন্ন (IUCN 3.1), SCHEDULE IV (WPA, 1972)

মুনিয়া:

এই প্রজাতির পাখির দেহের আকার এবং কাঠামো ছোটো। সঙ্গে ছোটো ঠোঁট, দীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট হয়। সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ১০-১২ সেমি হয়। পালক সাধারণত কালো ও সাদা রঙের হয়।

খাদ্য: বীজ।

সংরক্ষণ অবস্থা: লিস্ট কনসার্ন (IUCN 3.1), SCHEDULE IV (WPA, 1972)

গোল্ডেন ফিসান্ট:

গোল্ডেন ফিসান্ট বা চিনা ফিসান্ট গ্যালি ফরম্‌স বর্গের একটি বন্য পাখি।

সংরক্ষণ অবস্থা: লিস্ট কনসার্ন (IUCN 3.1), SCHEDULE IV (WPA, 1972)

জীবনকাল: প্রকৃতিতে ৫-৬ বছর বাঁচে। সংরক্ষিত অবস্থায় ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

সিলভার ফিসান্ট:

সংরক্ষণের অবস্থান : লিস্ট কনসার্ন (IUCN 3.1), SCHEDULE IV (WPA, 1972)

জীবন দশা: ৫-৬ বছর এরা প্রকৃতিতে বেঁচে থাকে। তবে সংরক্ষিত অবস্থায় ২০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

ময়ূর:

ভারতীয় ময়ূর বিশালাকৃতির ও উজ্জ্বল, সুদৃশ্য, সুন্দর পাখি। এর প্রকৃত বাসস্থান দক্ষিণ এশিয়া। কিন্তু সৌন্দর্য্যের কারণে একে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি ভারতবর্ষের জাতীয় পাখি।

সংরক্ষণ অবস্থা: লিস্ট কনসার্ন (IUCN 3.1), SCHEDULE IV (WPA, 1972)

জীবন কাল: ১৫-২০ বছর এরা প্রকৃতিতে বেঁচে থাকে। তবে সংরক্ষিত অবস্থায় ৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

দেশি বক:

সংরক্ষণ অবস্থা : লিস্ট কনসার্ন (IUCN 3.1), SCHEDULE IV (WPA, 1972)

জীবন দশা: সংরক্ষিত অবস্থায় এরা সর্বাধিক ২৩ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বেঙ্গল সাফারিতে চলে আসুন। বাঘ তার নিজস্ব প্রাকৃতিক বাসস্থানে, নিজস্ব পরিবেশে কীভাবে বাস করে তার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা খুব কাছ থেকে অর্জন করুন এবং মনের মণিকোঠায় সঞ্চয় করে রাখুন।

২৮-৪২ পৃষ্ঠার ছবিগুলি বেঙ্গল সাফারির ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত।

বাংলায় চালু হল বাংলাশ্রী এক্সপ্রেস

রাজধানী তথা মহানগরী কলকাতার সঙ্গে বিভিন্ন জেলা এবার জুড়ে গেল 'ননস্টপ' ভলভো বাস পরিষেবার মাধ্যমে। চালু হল বাংলাশ্রী এক্সপ্রেস। ১৮ জুলাই নবান্নের সামনে থেকে ননস্টপ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট বাতানুকূল বাসের পথ চলা শুরু হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এই বাসগুলি হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়াও মফস্সলের প্রতিটি জেলা সদর শহরের সঙ্গে কলকাতার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শারদোৎসবের আগে এটি বাংলার মানুষের প্রতি আমাদের উপহার। ৮০টি পরিবেশবান্ধব ই-বাস নামানো হবে। মানুষ যাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে জেলা থেকে কলকাতায় চলে আসতে পারেন, সেজন্য এই বাস চালু হল। জেলা সদর থেকে সোজা কলকাতায় আসবে এই বাস, কোথাও থামবে না। আপাতত ২০টি চালু হলেও আরও ৬টি বাস নামানো হবে। ২০১৭ সালে বন্যায় উত্তরবঙ্গ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। কিষানগঞ্জের কাছে রেললাইন ধসে গিয়েছিল। প্রায় দেড় মাস উত্তরবঙ্গের নানা জায়গার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন বাস পরিষেবাই ছিল যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম।

সমস্ত জেলাসদরে যাওয়ার এই বাসগুলি ছাড়বে ধর্মতলা থেকে। আসানসোলে যাওয়ার বাস ছাড়বে বিধাননগর করুণাময়ী থেকে।

এছাড়াও 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অ্যাম্বুলেন্স ও রেকার ভ্যান দেওয়া হয়।

কলকাতা থেকে			
কোচবিহার	১৬৪০ টাকা	আসানসোল	৪৭৫ টাকা
আলিপুরদুয়ার	১৬৩০ টাকা	পুরুলিয়া	৬৬০ টাকা
জলপাইগুড়ি	১৪০৫ টাকা	বাঁকুড়া	৪৮৫ টাকা
কালিম্পং (ভায়া শিলিগুড়ি)	১৪৫০ টাকা	ঝাড়গ্রাম	৩৯০ টাকা
দার্জিলিং (ভায়া শিলিগুড়ি)	১৪৪০ টাকা	মেদিনীপুর	৩১০ টাকা
রায়গঞ্জ	৯৮০ টাকা	তমলুক	১৯০ টাকা
বালুরঘাট	৯৪৫ টাকা	বর্ধমান	২৩৫ টাকা
মালদা	৭৪০ টাকা	চুঁচুড়া	১২০ টাকা
বহরমপুর	৫৩০ টাকা	কৃষ্ণনগর	২৫০ টাকা
সিউড়ি	৫১০ টাকা	বারাসত	৪৫ টাকা

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-১	কোচবিহার	কলকাতা-কোচবিহার	এসি ভলভো	৭৪৬	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	কোচবিহার
					বিকেল ৫টা ৩০মিনিট	রাত ৯টা ৪৫মিনিট
					কোচবিহার	কলকাতা
					ভোর ৫টা	সকাল ৯টা ১৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	উত্তরবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	এনবিএসটিসি ডিপো	কলকাতা	১৬৪০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-২	আলিপুরদুয়ার	কলকাতা-আলিপুরদুয়ার	এসি ভলভো	৭৪১	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	আলিপুরদুয়ার
					ভোর ৪টা ৩০মিনিট	সকাল ৮টা ৪৫মিনিট
					আলিপুরদুয়ার	কলকাতা
					বিকেল ৪টা	রাত ৮টা ১৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম (ফ্র্যানচাইসি)	এনবিএসটিসি ডিপো	কলকাতা	১৬৩০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-৩	জলপাইগুড়ি	কলকাতা-জলপাইগুড়ি	এসি ভলভো	৬৩৮	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	জলপাইগুড়ি
					সন্ধ্যে ৭টা ৩০মিনিট	রাত ১০টা ৪৫মিনিট
					জলপাইগুড়ি	কলকাতা
					সন্ধ্যে ৬টা ৩০মিনিট	সকাল ৯টা ৪৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম (ফ্র্যানচাইসি)	জলপাইগুড়ি বাস টার্মিনাস	কলকাতা	১৪০৫
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
বিই-৪	কালিম্পং	কলকাতা-কালিম্পং (কলকাতা-শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি-কলকাতা)	এসি ভলভো+এসি লাক্সারি মিনি	৬৬৫	কলকাতা	কালিম্পং
					সন্ধ্যে ৬টা ৩০মিনিট	রাত ১২টা ৩০মিনিট
					কালিম্পং	কলকাতা
					রাত ১টা ৩০মিনিট	সকাল ৬টা ৩০মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	উত্তরবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	কালিম্পং পুরসভা বাসস্ট্যান্ড	কলকাতা	১৪৫০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
বিই-৫	দার্জিলিং	কলকাতা-দার্জিলিং (কলকাতা-শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি-দার্জিলিং)	এসি ভলভো+ এসি লাক্সারি	৬৬০	কলকাতা	দার্জিলিং
					সন্ধ্যে ৬টা ৩০মিনিট	দুপুর ১২টা
					দার্জিলিং	কলকাতা
					রাত ১টা ৩০মিনিট	সকাল ৬টা ৩০মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	উত্তরবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	বাসস্ট্যান্ড (চক বাজার)	কলকাতা	১৪৪০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
বিই-৬	উত্তর দিনাজপুর	কলকাতা-রায়গঞ্জ	এসি ভলভো	৪১০	কলকাতা	দার্জিলিং
					রাত ৯টা	সকাল ৭টা
					রায়গঞ্জ	কলকাতা
					রাত ৮টা ৩০মিনিট	সকাল ৬টা ১৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	উত্তরবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম (ফ্র্যানচাইসি)	উত্তরবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম টার্মিনাস	কলকাতা	৯০০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-৭	দক্ষিণ দিনাজপুর	কলকাতা-বালুরঘাট	এসি ভলভো	৪৩০	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	বালুরঘাট
					সন্ধ্যে ৭টা	সকাল ৬টা ৩০মিনিট
					বালুরঘাট	কলকাতা
					রাত ৮টা	সকাল ৭টা ৩০মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম	বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	৯৪৫
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-৮	মালদা	কলকাতা-মালদা	এসি ভলভো	৩৩৫	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	মালদা
					রাত ১০টা	সকাল ৬টা ৩০মিনিট
					মালদা	কলকাতা
					রাত ৯টা	সকাল ৫টা ৩০মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম (ফ্র্যানচাইসি)	মালদা বাস টার্মিনাস	কলকাতা	৭৪০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-৯	মুর্শিদাবাদ	কলকাতা-বহরমপুর	এসি ভলভো	২৪২	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	বহরমপুর
					বিকাল ৫টা ১০মিনিট	রাত ১০টা ১০মিনিট
					বহরমপুর	কলকাতা
					সকাল ৫টা ১৫মিনিট	সকাল ১০টা ১৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগম	বহরমপুর বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	৫৩০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-১০	বীরভূম	কলকাতা-সিউড়ি	এসি ভলভো	২৩৪	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	সিউড়ি
					বিকাল ৪টে ৩০মিনিট	রাত ৯টা
					সিউড়ি	কলকাতা
					সকাল ৭টা ১৫মিনিট	সকাল ১১টা ৪৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম	সিউড়ি বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	৫১০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-১১	পশ্চিম বর্ধমান	কলকাতা-আসানসোল (করুণাময়ী)	এসি ভলভো	২২৫	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					করুণাময়ী	আসানসোল
					দুপুর ২টা ৪৫মিনিট	বিকাল ৬টা ৫৫মিনিট
					আসানসোল	করুণাময়ী
					সকাল ৬টা ১৫মিনিট	সকাল ১০টা ২৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম	চেলিডাঙা বাসস্ট্যান্ড	করুণাময়ী সল্টলেক	৪৭৫
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
বিই-১২	পুরুলিয়া	কলকাতা-পুরুলিয়া	এসি ভলভো	৩০০	যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	পুরুলিয়া
					দুপুর ২টা	রাত ৮টা ৩০মিনিট
					পুরুলিয়া	কলকাতা
					সকাল ৫টা ৪৫মিনিট	বেলা ১২টা ৩০মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম	পুরুলিয়া বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	৬৬০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
বিই-১৩	বাঁকুড়া	কলকাতা-বাঁকুড়া	এসি ভলভো	২২০	কলকাতা	বাঁকুড়া
					বিকাল ৪টা ৪৫মিনিট	রাত ৯টা
					বাঁকুড়া	কলকাতা
					সকাল ৬টা ৩০মিনিট	সকাল ১০টা ৪৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	বাঁকুড়া বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	৪৮৫
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি. মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
বিই-১৪	ঝাড়গ্রাম	কলকাতা-ঝাড়গ্রাম	এসি ভলভো	১৭৮	কলকাতা	ঝাড়গ্রাম
					দুপুর ৩টে	রাত ৭টা ৩০মিনিট
					ঝাড়গ্রাম	কলকাতা
					সকাল ৬টা ১৫মিনিট	সকাল ১০টা ৪৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	ঝাড়গ্রাম বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	৩৯০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
বিই-১৫	পশ্চিম মেদিনীপুর	কলকাতা-মেদিনীপুর	এসি ভলভো	১৪২	কলকাতা	মেদিনীপুর
					বিকাল ৫টা ৪৫মিনিট	রাত ৯টা ১৫মিনিট
					মেদিনীপুর	কলকাতা
					সকাল ৬টা ৩০মিনিট	সকাল ১০টা

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	মেদিনীপুর বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	৩১০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	তমলুক
বিই-১৬	পূর্ব মেদিনীপুর	কলকাতা-তমলুক	এসি ভলভো	৮৫	বিকাল ৫টা ১৫মিনিট	সন্ধ্যা ৭টা ৫মিনিট
					তমলুক	কলকাতা
					সকাল ৭টা ৪৫মিনিট	সকাল ৯টা ৩৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	দুর্গাচক	কলকাতা	১৯০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	বর্ধমান
বিই-১৭	পূর্ব বর্ধমান	কলকাতা-বর্ধমান	এসি ভলভো	১০৬	বিকাল ৫টা ৩০মিনিট	সন্ধ্যা ৭টা ৪৫মিনিট
					বর্ধমান	কলকাতা
					সকাল ৭টা	সকাল ৯টা ১৫মিনিট

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	নবাব হাট বাসস্ট্যান্ড	কলকাতা	২৩৫
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
					কলকাতা	চুঁচুড়া
বিই-১৮	হুগলি	কলকাতা- চুঁচুড়া	এসি ভলভো	৫৫	সন্ধ্যে ৬টা	রাত ৮টা
					চুঁচুড়া	কলকাতা
					সকাল ৮টা	সকাল ১০টা

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	চুঁচুড়া বাসস্ট্যান্ড (ঘড়ির মোড়)	কলকাতা	১২০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
বিই-১৯	নদিয়া	কলকাতা-কৃষ্ণনগর	এসি ভলভো	১১৫	কলকাতা	কৃষ্ণনগর
					বিকাল ৪টে	সন্ধ্যা ৭টা
					কৃষ্ণনগর	কলকাতা
					সকাল ৭টা	সকাল ১০টা

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	কৃষ্ণনগর বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	২৫০
দৈনিক				

রুট নং	জেলা	যাত্রাপথ	বিভিন্ন বাসের ধরন	দূরত্ব (কি.মি.)	সময়	
					যাত্রারম্ভ	গন্তব্যস্থল
বিই-২০	উত্তর ২৪ পরগনা	কলকাতা-বারাসত	এসি ভলভো	২৭	কলকাতা	বারাসত
					সন্ধ্যে ৭টা	রাত ৮টা ৫০মিনিট
					বারাসত	কলকাতা
					সকাল ৮ টা	সকাল ১০টা

কবে চলবে	অপারেটর	টার্মিনাস (জেলাশহর)	টার্মিনাস (কলকাতা)	ভাড়া (টাকা)
দৈনিক	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	তিতুমির বাস স্ট্যান্ড	কলকাতা	৪৫
দৈনিক				

অত্যাধুনিক জীবনদায়ী সরঞ্জামসহ ট্রমাকেয়ার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রহণকারী	অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা	ক্রমিক সংখ্যা	গ্রহণকারী	অ্যাম্বুল্যান্সের সংখ্যা
১.	এস.পি.পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা	১	১২.	রায়গঞ্জ পুরসভা	১
২.	এস.পি.নদিয়া জেলা	১	১৩.	পাঁশকুড়া পুরসভা	১
৩.	এস.পি.মুর্শিদাবাদ জেলা	১	১৪.	বহরমপুর পুরসভা	১
৪.	এস.পি.ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলা	১	১৫.	ডোমকল পুরসভা	১
৫.	এস.পি.দার্জিলিং জেলা	১	১৬.	পূর্ব মেদিনীপুর(দীঘা থানার জন্য)	১
৬.	এস.পি.জলপাইগুড়ি জেলা	১	১৭.	এক্সিকিউটিভ অফিসার-ডি.এস.ডি.এ	১
৭.	এস.পি.দক্ষিন দিনাজপুর জেলা	১	১৮.	পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম	১
৮.	এস.পি.ঝাড়গ্রাম জেলা	১	১৯.	দক্ষিনবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ নিগম	১
৯.	এস.পি.আলিপুরদুয়ার জেলা	১	২০.	উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহণ নিগম	১
১০.	এস.পি.(হুগলি গ্রামীণ)	১	২১.	পরিবহণ দপ্তর	২
১১.	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভা	১			
মোট					**২২**

* প্রতি ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মূল্য — ১৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৩০ টাকা (জিএসটি বাদ দিয়ে)

১৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক রেক্যারভ্যান

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রহণকারী	রেক্যার ভ্যানের সংখ্যা
১.	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	১
২.	দক্ষিণবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	১
৩.	উত্তরবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	১
৪.	এস.পি. পূর্ব বর্ধমান	১
৫.	এস.পি. নদিয়া	১
৬.	এস.পি.-মুর্শিদাবাদ	১
৭.	এস.পি.-উত্তর দিনাজপুর	১
৮.	এস.পি.-দক্ষিণ দিনাজপুর	১
৯.	এস.পি.-আলিপুরদুয়ার	১
১০.	এস.পি.-কোচবিহার	১
১১.	এস.পি.-শিলিগুড়ি	১
১২.	এস.পি.ডায়মন্ডহারবার পুলিশ জেলা	১
১৩.	এস.পি.-মালদা	১
মোট		**১৩**

উন্নয়নের স্বার্থে অর্থ কমিশনের কাছে

ঋণের বোঝা লাঘবের দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এনকে সিং এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী

উন্নয়নের স্বার্থে ঋণের বোঝা লাঘব করুক কেন্দ্রীয় সরকার এবং অর্থ কমিশন। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার একের পর এক উন্নয়নমুখী জনহিতকর প্রকল্প চালাচ্ছে রাজ্যে। ঋণ পরিশোধের বিষয়টির পুনর্বিন্যাস না হলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। ফলে অর্থ কমিশন দ্রুত পথ বের করুক। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান-সহ সদস্য প্রতিনিধিদের সামনে এভাবেই নিজেদের দাবি তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় করের প্রাপ্য বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় সেস ও সারচার্জের অংশ, রাজস্ব ঘাটতি-সহ পরিকাঠামো এবং প্রশাসনিক সংস্থায় পুরসভা ও পঞ্চায়েতের জন্য অনুদান বৃদ্ধির দাবি জানালেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ১৭ জুলাই অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান নন্দকিশোর সিং-সহ অন্যান্য সদস্য প্রতিনিধি শক্তিকান্ত দাস, ড. অনুপ সিং, ড. অশোক লাহিড়ি, ড. রমেশ চাঁদ ও সচিব অরবিন্দ মেহতা এসেছিলেন নবান্নে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতে। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন নানা প্রকল্প তুলে ধরে রাজ্যের উন্নয়নের ঊর্ধ্বমুখী লেখচিত্রকে উপস্থাপন করেন, তেমনি ঋণ মকুবের দীর্ঘদিনের দাবি ফের অর্থ কমিশনের সামনে পেশ করেন। বৈঠক শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, রাজ্যের তরফে ঋণমুক্তির জোড়ালো দাবি ও পরিসংখ্যান পেশ করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারটি অবশ্যই রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করা হবে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছরে রাজস্ব আদায় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি-সহ বহু ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রশংসাও এদিন শোনা গিয়েছে চেয়ারম্যানের মুখে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী অর্থ কমিশনের সামনে পেশ করা স্মারকলিপিতে যেভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন, তা নিম্নরূপ:

চলতি অর্থ কমিশনে ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্যভিত্তি ব্যবহারের বিরোধিতা:

- **প্রতিটি রাজ্যের প্রতি বরাদ্দ অর্থের ক্ষেত্রে অর্থ কমিশন তাদের হাতে থাকা নথি বা টার্মস অব রেফারেন্স হিসেবে ২০১১ সালের আদমশুমারির হিসেব ব্যবহার করছে। আমরা এর চরম বিরোধিতা করছি। কারণ এটা ঠিক নয়। আমরা মনে করি, যে রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যত বেশি গঠনমূলক কাজ করছে এবং ফলে সেই রাজ্যের জনসংখ্যা সাম্প্রতিক অতীতে সেই হারে বৃদ্ধি পায়নি, তাদের অবশ্যই বেশি আর্থিক সাহায্য পাওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেসব রাজ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কম হওয়ার ফলে লোকসংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের বেশি আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।**

যে রাজ্য ভালো কাজ করছে, তাদের এভাবে ন্যায্য দাবি বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অযৌক্তিক।

কমিশনের কাছে আমাদের দাবি, প্রতি রাজ্যের আর্থিক বরাদ্দের বিষয় ভাবনার ক্ষেত্রে ১৯৭১-এর জনসংখ্যাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরা উচিত।

পূর্বতন সরকারের প্রচুর ঋণের বোঝা এবং কর্মসংস্কৃতির অবক্ষয়:

- **২০১১ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসেছে।**
- **শেষ ৭ বছর যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং—কারণ পূর্বতন সরকারের প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার ঋণের বোঝা, 'ঘেরাও' এবং 'বনধ' সংস্কৃতি, কর্মসংস্কৃতির অপব্যবহার, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির বিবদমান কাজকর্ম এবং সামাজিক ও আর্থিক পরিকাঠামো না থাকা।**

প্রচুর ঋণের বোঝা:

- শেষ ৭ বছরে, সুদ এবং আসল মিলিয়ে এই সরকার ২ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা ফেরত

রাজ্যের দাবি

- কেন্দ্রীয় করের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভাগ ৪২ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ করা হোক এবং কেন্দ্রীয় সেস, সারচার্জ যুক্ত করা হোক।
- রাজস্ব ঘাটতি প্রদান বাবদ ৯০ হাজার ১৩৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।
- পরিকাঠামো খাতে প্রদান বাবদ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৯২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা এবং প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের জন্য ২৫ হাজার ৮৩০ কোটি ১ লক্ষ টাকা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বাবদ ৫ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা এবং জলাভূমি ও বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য ২ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা প্রদান।
- গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার (পঞ্চায়েত) জন্য ৪২ হাজার ৩১৯ কোটি টাকা এবং নগরাঞ্চলের স্থানীয় সংস্থার (পুরসভা) জন্য ২২ হাজার কোটি টাকা প্রদান।

অর্থ কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের দাবি তুলে ধরছেন মুখ্যমন্ত্রী

দিয়েছে। এই আর্থিক বছরেই শুধু আমাদের দিতে হয়েছে ৪৬ হাজার কোটি টাকা।

- আপনারা কল্পনা করতে পারছেন, কীভাবে এই বিপুল অর্থের বোঝা মাথায় নিয়েও **এই সরকার এই রাজ্যের মানুষের উন্নয়নের চিন্তা-ভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে লড়াই করে চলেছে।**
- প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও **সর্বাধিক স্বচ্ছতা ও আর্থিক সঙ্গতি বজায় রাখতে রাজস্বঘটিত ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজা হয়েছে** এবং রাজ্যের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে কাজ করে চলেছে এই রাজ্য।

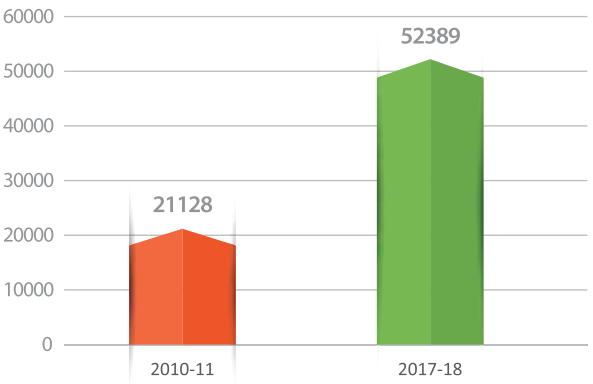

রাজ্যের নিজস্ব কর আদায় বৃদ্ধি (কোটি টাকায়)

দ্বিগুণ রাজস্ব :

- আপনারা জেনে খুশি হবেন, **২০১০-১১ সালে রাজস্ব ২১ হাজার ২১৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৫২ হাজার ৩৮৯ কোটি টাকা হয়েছে। এই বৃদ্ধি দ্বিগুণের বেশি।**

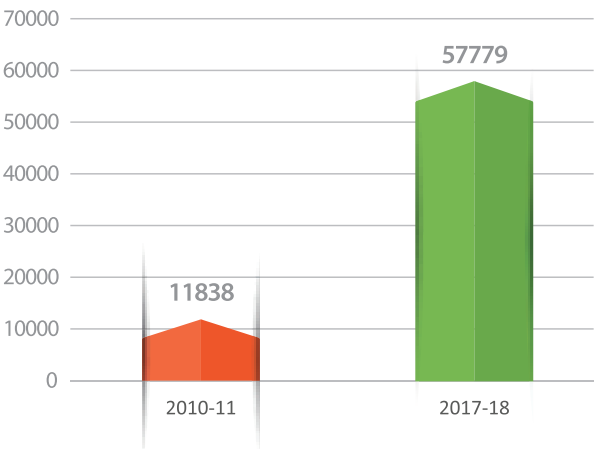

রাজ্যের পরিকল্পিত ব্যয় বৃদ্ধি (কোটি টাকায়)

অতিরিক্ত জিএসটি :

- **পরিকল্পিত জিএসটি আদায় এবং রাজস্বের ব্যবধান যেখানে ২০১৭-র আগস্টে ছিল ৩৩.৪ শতাংশ, সেখানে তা ২০১৮-র মার্চে অতিরিক্ত ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।**

পশ্চিমবঙ্গে যেখানে জিএসটি আদায় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে গোটা দেশে ২০১৮-র মার্চের হিসেবে ১৭.৯ শতাংশ ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

অতিরিক্ত ঘাটতি হ্রাস :

- একইভাবে, ২০১৭-১৮ সালে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩ শতাংশ রাজস্ব ঘাটতির হিসেবে, বর্তমান রাজস্ব ঘাটতি ৩.৭৫ শতাংশ থেকে ০.৫১ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে।

অন্যদিকে ঋণ ও রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাত ৪০.৬৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৪.৪৭ শতাংশে নিয়ে আসা হয়েছে।

এর ফলে প্রচুর পরিমাণে ঋণের সুদের বোঝা সামলেও এই রাজ্য বর্তমানে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়কারী রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

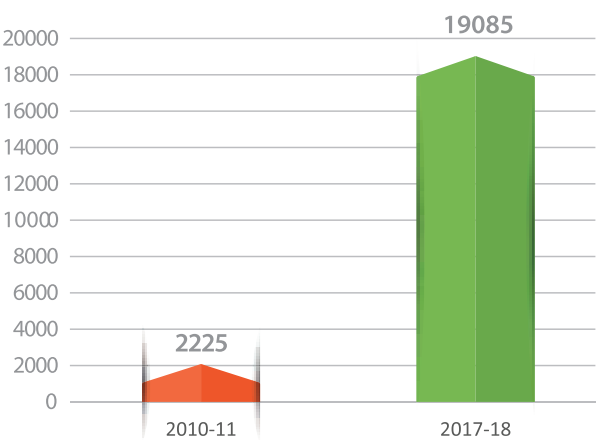

মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি (কোটি টাকায়)

সম্পত্তি তৈরি এবং সমাজকল্যাণে বেশি জোর :

- রাজস্বের সঠিক ব্যবস্থাপন এবং আয়ের সদ্-ব্যবহার—এই দুটি বিষয়কে মাথায়

রেখে আমরা **শিল্প, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, কর্মসংস্থান, সেতু—রাস্তাঘাট—বিদ্যুৎ—মহিলা ও শিশু কল্যাণ ইত্যাদি সামাজিক পরিকাঠামো তৈরির মতো বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জোর** দিয়েছি।

- **সম্প্রতি রাজ্যের** বিভিন্ন জায়গায় উড়ালপুল, গ্রামীণ ও শহরে পানীয় জল প্রকল্প, রাস্তাঘাট, উড়ালপুল, বিদ্যুৎ, সাশ্রয়ী মূল্যের গৃহ, জলসেচ ইত্যাদি **নতুন পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ** করা হয়েছে।

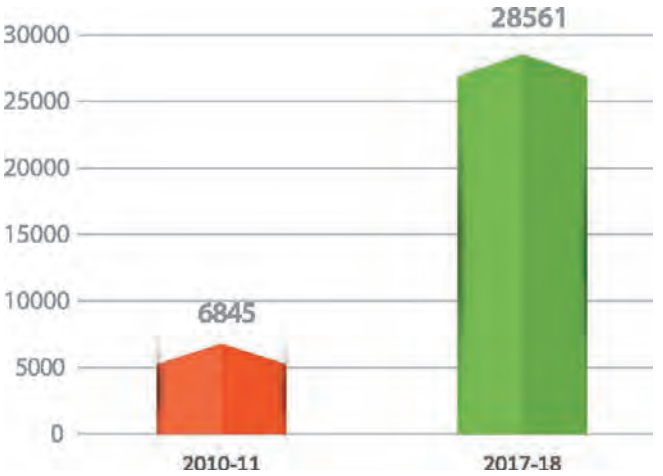

সামাজিক পরিকাঠামোর বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

বর্তমান আর্থিক বছরে যে **২৫ হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা মূলধনী ব্যয় হিসেবে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে,** উপরোক্ত অর্থ **তারও অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসেবে** কাজে লাগানো হবে।

- **সামাজিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের সরকারি প্রকল্প এই রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছুঁয়ে রয়েছে :**
  - রাজ্যের প্রায় ১০ কোটি **জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ মানুষ** কোনও না কোনওভাবে এক বা একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।
  - রাজ্যের প্রত্যেক চুক্তিভিত্তিক/ঠিকে/দৈনিক শ্রমিককে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত **চাকরির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত** করা হয়েছে।
  - সারা পৃথিবীতে সম্মানপ্রাপ্ত **কন্যাশ্রী (কন্যা সশক্তিকরণ)** প্রকল্প (প্রায় ৫০ লক্ষ কন্যাশ্রী)
  - **সবুজশ্রী (সবুজ পরিবেশ)** (প্রায় ১৭ লক্ষ চারা বিলি)
  - **সবুজসাথী (পরিবেশ-বান্ধব পরিবহন)** (১ কোটি সাইকেল ইতিমধ্যেই বিলি)
  - **শিক্ষাশ্রী (প্রান্তিক মানুষের জন্য শিক্ষা)** (তপশিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের ৫৮ লক্ষেরও বেশি স্কলারশিপ প্রদান।
  - **সংখ্যালঘু স্কলারশিপ** (১ কোটি ৭১ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রীকে ৪ হাজার ২২০ কোটি টাকার বেশি স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে)
  - **সংখ্যালঘু ঋণ** (স্বনির্ভরতা এবং স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ৮ লক্ষের বেশি যুবক-যুবতীকে ইতিমধ্যেই ১,৩০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে।
  - **গতিধারা (কর্মহীন যুবক-যুবতীদের বাণিজ্যিক গাড়ি কেনার জন্য সাহায্য)** (২৪ হাজারের বেশি বাণিজ্যিক গাড়ির অনুমোদন হয়েছে)
  - **সকলের জন্য স্বাস্থ্য**
    - প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে **বিনামূল্যে ওষুধ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা।**
    - **প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ২০১০-১১ সালের ৬৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৯৬ শতাংশ।**

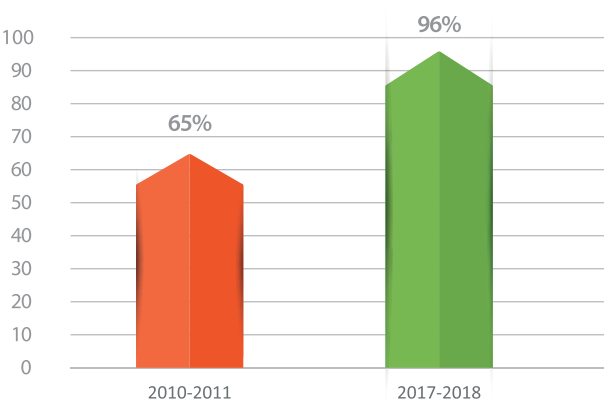

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি

- ✸ **প্রসবকালীন মায়েদের মৃত্যুর হার ২০০৭-০৯ সালে ১৪৫ থেকে কমে এখন ১১২ জন।**
- ✸ **শিশুমৃত্যুর হার ২০১০ সালে ৩২ জন থেকে কমে এখন ২৪-এ।**
- ✸ **২০১১ সাল থেকে ৬৮টি সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট (SNCU) তৈরি হয়েছে—২০১১ সালের আগে এই সংখ্যা ছিল ৬টি।**
- ✸ **২০১১ সাল থেকে ৩০৭টি সিক নিউবর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট (SNSU) তৈরি হয়েছে—২০১১ সালের পূর্বে এর কোনও অস্তিত্ব ছিল না।**
- ✸ **জেলা/মহকুমা হাসপাতালে ৬৫টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট/হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (CCU/HDU) তৈরি হয়েছে—২০১১ সালের আগে এই পরিষেবার অস্তিত্বই ছিল না—মহকুমা স্তর পর্যন্ত ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য।**
- ✸ **মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ১৬টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব তৈরি করা হয়েছে।**
- ✸ **স্বাস্থ্যসাথী (স্বাস্থ্যবিমা)** (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কেবল্ টিভি অপারেটর ইত্যাদি পেশায় প্রায় ৪৫ লক্ষের বেশি সুবিধাভোগী ইতিমধ্যেই সুবিধাভোগী)
- ✸ **আবাসন**—পৌর ও গ্রামীণ এলাকায় আবাসন প্রকল্পে প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবার ইতিমধ্যেই উপকৃত।
- ✸ **সমব্যথী (মানবিক সাহচর্য)** (প্রায় ২ লক্ষ মানুষ উপকৃত)

- আপনি জেনে খুশি হবেন যে, সমস্ত ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের **কৃষক পরিবারের আয় ৬ বছরে প্রায় ৩.২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালে এই আয় যেখানে ছিল ৯১ হাজার টাকা, সেখানে ২০১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।**

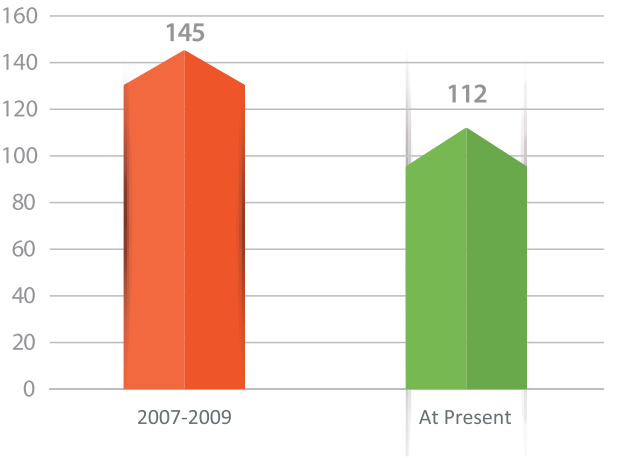

প্রসবকালীন মৃত্যুর হার হ্রাস

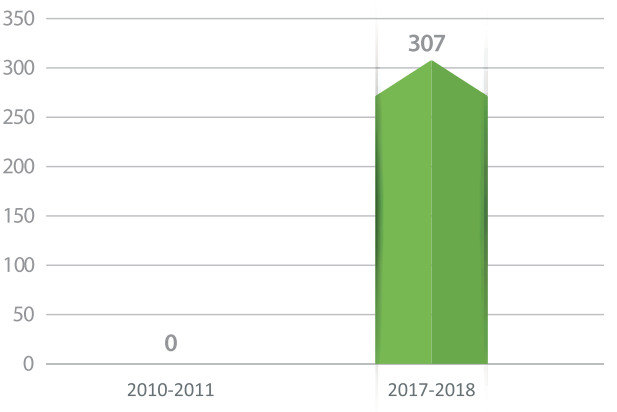

সিক নিউবর্ন স্টেবিলাইজেশন ইউনিট-এর সংখ্যা বৃদ্ধি

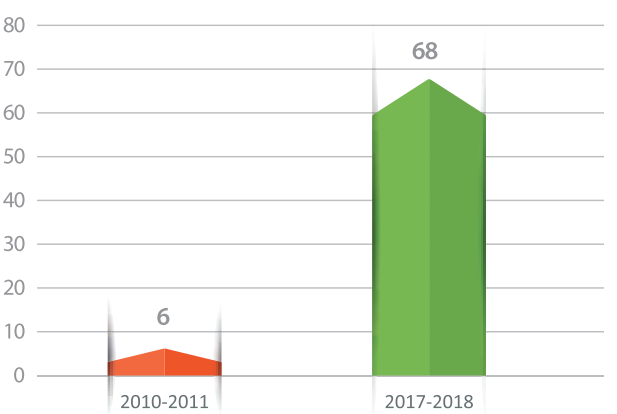

সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট-এর সংখ্যা বৃদ্ধি

- সর্বোচ্চ ফলনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পরপর ৫ বার কৃষি কর্মণ সম্মানে ভূষিত।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে, গত ৭ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৪৮টি নতুন কলেজ এবং ২৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি:

রাজ্যে যোজনা খাতে ব্যয় ২০১০-১১ সালে ১১ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা থেকে ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৫৭ হাজার ৭৭৯ কোটি টাকা হয়েছে।

মূলধনী ব্যয় ২০১০-১১ সালে ২ হাজার ২২৫ কোটি টাকা থেকে প্রায় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে ১৯ হাজার ৮৫ কোটি টাকা হয়েছে।

- পশ্চিমবঙ্গ এখন অনেক ক্ষেত্রে প্রথম :
  - শ্রম দিবস তৈরি এবং ১০০ দিনের কাজে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রথম
  - গ্রামীণ আবাসন এবং গ্রামীণ সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে প্রথম
  - সংখ্যালঘুদের ঋণের ব্যবস্থা এবং এই সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম
  - ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম
  - স্কিলের মানোন্নয়নে প্রথম
  - কাজে স্বচ্ছতা এবং ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম

দেশের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী হল আমাদের রাজ্য, যেখানে অনায়াসে বাণিজ্য সম্ভব।

সামনে প্রতিবন্ধকতা :

- যদিও আমরা পূর্বতন সরকারের **বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা** মাথায় নিয়ে কাজ শুরু করেছি, **কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোনও ধরনের সহযোগিতা** আমরা **পাইনি**। সুতরাং আপনি এ বিষয়ে একমত হবেন যে, আমার সরকারের পক্ষে **সমস্ত ধরনের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে** রাজ্য চালানো ভীষণ কঠিন।

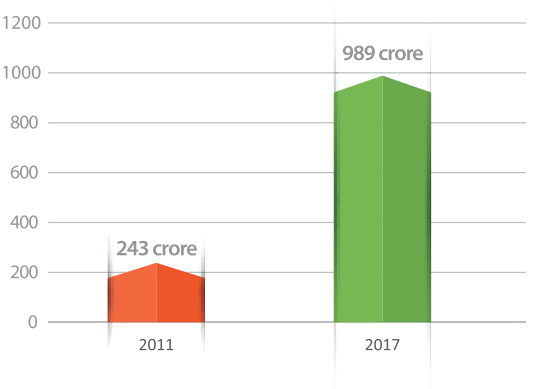

লম্বি ও শিলা পরিকাঠামো বৃদ্ধি (টাকায়)

এ সমস্ত কিছু সত্ত্বেও রাজ্যের মোট মূল্যযুক্ত উৎপাদনের শতাংশ হিসেবে মূলধনী ব্যয় ২০১০-১১ সালের ০.৫৭ থেকে ২০১৭-১৮ সালে ১.৯৩-তে উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ হ্রাস :

- চতুর্দশ অর্থ কমিশনে কেন্দ্রীয় করে রাজ্যের যে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ ৩২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪২ শতাংশ করা হয়েছিল, তা শুধুমাত্র চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়।
- **কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত প্রকল্পগুলির পুনর্গঠনের একক সিদ্ধান্তের ফলে** সেই তথাকথিত বৃদ্ধি আবার কমে গেছে।
- **৩৮টি প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে রাজ্য সরকার বর্তমানে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে এই প্রকল্পগুলি চালাচ্ছে।**
- এ ধরনের **৫৮টি চালু সরকারি প্রকল্পে রাজ্যের ভাগের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়।** এর ফলে রাজ্যের নিজস্ব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি কাটছাঁট করতে হয়েছে।

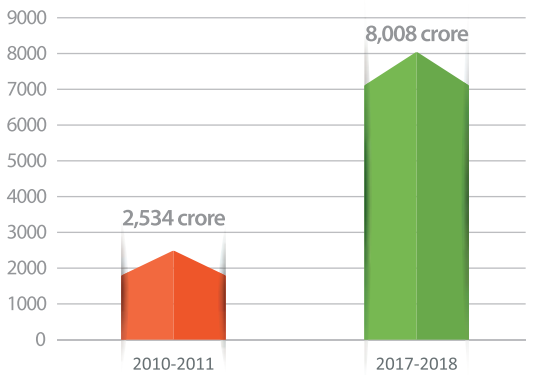

একশো দিনের কাজে ব্যয় বৃদ্ধি (টাকায়)

রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই :

- আমাদের দাবি ছিল, **রাজ্যের সম্মতি না নিয়ে কোনও ধরনের কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প যেন চালু না হয়**, কারণ এতে রাজ্যের অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে।
  কিন্তু এটি কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করেনি।
  আমরা কমিশনের কাছে আবেদন জানাতে চাই, এই ধরনের কিছু প্রকল্প শুরু করার আগে রাজ্যের সঙ্গে যেন অবশ্যই আলোচনা করে নেওয়া হয়।

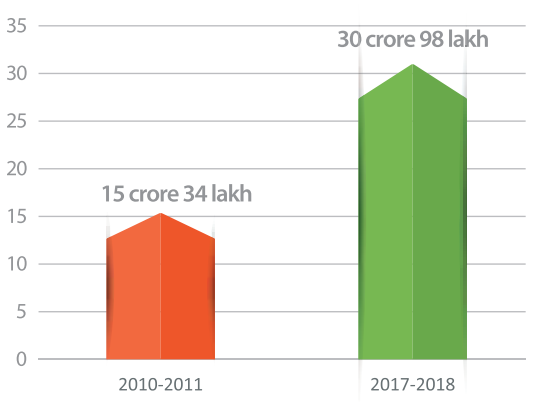

একশো দিনের কাজে শ্রমদিবস তৈরি

কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ ছাড়/পুনর্বিন্যাস ঘটায়নি :

আমার সরকার ঋণ ছাড় বা পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে কেন্দ্রের সমর্থন চেয়েছিল। যাতে ঋণের টাকা ফেরৎ

দেওয়ার বদলে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অর্থ ব্যয় করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, **কোনও ধরনের সাহায্যই করা হয়নি।**

ব্যাকওয়ার্ড রিজিয়নস গ্র্যান্ট ফান্ড (বিআরজিএফ) স্থগিত :

- ইউপিএ সরকারের আমলে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নতির জন্য বিআরজিএফ প্রকল্পে ৮ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। **কিন্তু কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাকি ২ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে এবং রাজ্যকে নিজের সম্পদ ব্যবহার করে অসমাপ্ত প্রকল্পগুলি শেষ করতে বাধ্য করা হয়েছে।**

কর বিভাজনে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা :

- **কেন্দ্রের একটি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক প্রবণতা** হল, সেস এবং সারচার্জ-সহ বিভিন্ন রাজ্যকে তাদের কেন্দ্রীয় করের সঠিক বিভাজন থেকে বঞ্চিত করা এবং এই অর্থ বিভিন্ন রাজ্যকে প্রদেয় অর্থের মধ্যেও ধরা হয় না। এই সমস্যা আরও গভীর হয়েছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি করের পরিমাণ কমিয়েছে এবং অতিরিক্ত সেস ও সারচার্জ বসিয়ে এই কম আদায়ীকৃত অর্থ সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

আমরা কমিশনের কাছে এই দাবি জানাচ্ছি যে, কমিশন বিষয়টি নজরে দিক এবং কেন্দ্রের উদ্যোগে এই ধরনের কাজকর্ম যাতে বন্ধ হয়, সেটি সুনিশ্চিত করুক।

জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে অর্থ প্রদান :

- বর্তমানে অর্থ কমিশন গ্রাম পঞ্চায়েতকে সরাসরি অর্থ প্রদান করে। কিন্তু ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকারী কোনও সংস্থার মাধ্যমে জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতিকেও অর্থ প্রদানের বিষয়টি অর্থ কমিশনের আওতাভুক্ত করা উচিত। আমরা তীব্রভাবে এর দাবি জানাচ্ছি।

বাংলার সামনে এক নতুন প্রতিবন্ধকতা :

- **আমাদের রাজ্যের জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ হল পিছিয়ে পড়া তপশিলি জাতি—উপজাতি—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।** পশ্চিমবঙ্গ হল উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে প্রবেশের দরজা এবং **বাংলাদেশ—নেপাল ও ভুটানের মতো বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে লম্বা আন্তর্জাতিক সীমানা।**
- পশ্চিমবঙ্গ এমন এক নিচু ভূমির রাজ্য, যেখানে প্রতিবছর প্রবল বন্যা হয়। ডিভিসি এবং ফরাক্কা আবার অতিরিক্ত প্লাবনের জন্য দায়ী। এছাড়া এই রাজ্যে পলি জমা ও ভূমি ক্ষয়ের প্রবল সমস্যাও রয়েছে।

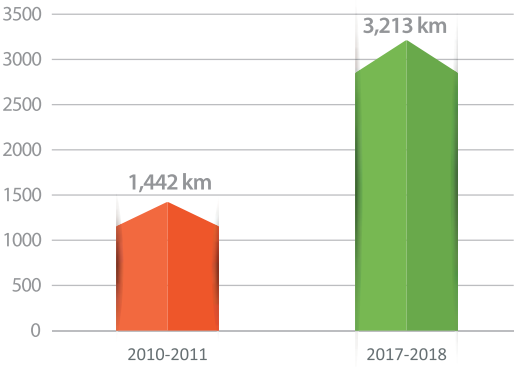

বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনা(গ্রামীণ রাস্তা তৈরি)

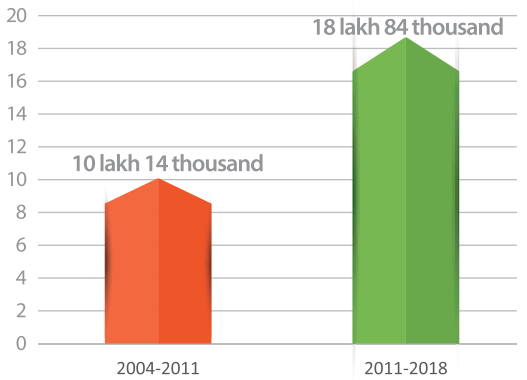

বাংলার আবাস যোজনা (গৃহ নির্মাণ)

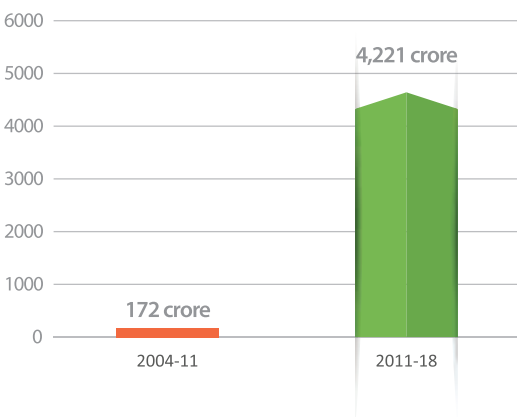

সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি

- পলি তোলা, রিং বাঁধ তৈরি, চেক বাঁধ পরিস্কার, ভূমিক্ষয় রোধ-সহ নানা প্রকল্পের বিষয় কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণে ঘাটাল এবং কান্দি মাস্টার প্ল্যানের সামগ্রিক পরিকল্পনাও জমা পড়ে আছে।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণে অর্থ বরাদ্দ আরও সমস্যায় পড়েছে।

এই সমস্ত অত্যধিক সমস্যা **রাজ্যের সম্পদে বাড়তি বোঝা** তৈরি করছে এবং এর ফলে মানুষের পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে।

কমিশনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা তাদের সুপারিশে যেন বিষয়গুলি বিবেচনা করে।

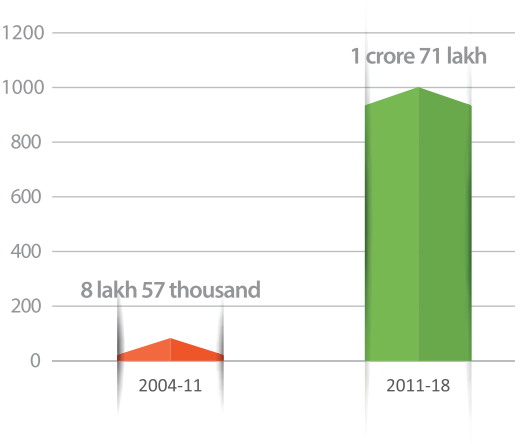

সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি

আমাদের দাবিসমূহ :

আমরা আমাদের ব্যাপক দাবি-দাওয়া কমিশনের কাছেস্মারকলিপির মাধ্যমে উপস্থাপিত করছি।

- আমরা আবেদন করেছি, **কেন্দ্রীয় করের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভাগ ৪২ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ করা** হোক এবং **এই ভাগে কেন্দ্রীয় সেস, সারচার্জ যুক্ত করা হোক।**
  - ✓ **রাজস্ব ঘাটতি প্রদান বাবদ ৯০ হাজার ১৩৬ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।**
  - ✓ পরিকাঠামো খাতে প্রদান বাবদ ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৯২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা এবং **প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের জন্য ২৫ হাজার ৮৩০ কোটি ১ লক্ষ টাকা।**
  - ✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা বাবদ ৫ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা এবং **জলাভূমি ও বনাঞ্চল সংরক্ষণের জন্য ২ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা প্রদান।**
  - ✓ **গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থার (পঞ্চায়েত) জন্য ৪২ হাজার ৩১৯ কোটি টাকা** এবং **নগরাঞ্চলের স্থানীয় সংস্থার (পুরসভা) জন্য ২২ হাজার কোটি টাকা** প্রদান।

রাজ্যের এবং এখানকার মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে **কমিশন যাতে সদর্থক ভূমিকা নেয়**, তার আবেদন জানাচ্ছি।

আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে, পশ্চিমবঙ্গের মতো ঋণে জর্জরিত রাজ্যের ক্ষেত্রে **ঋণ মকুব বা ঋণ পুনর্বিন্যাসের বা অন্য কোনও** পদ্ধতির কথা কমিশন পুনর্বিবেচনা করুক। যাতে এই রাজ্য এবং **রাজ্যবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে আমরা আমাদের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে পারি।**

অসমের খসড়া নাগরিকপঞ্জি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বেগ প্রকাশ

৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে অসমের ঘোষিত খসড়া জাতীয় নাগরিকপঞ্জি থেকে ৪০ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভারতীয় নাগরিকেরা তাঁদের নিজের দেশেই উদ্‌বাস্তু হয়ে যাচ্ছেন।

তিনি ওইদিন দিল্লি সফরের প্রাক্‌কালে একটি সাংবাদিক বৈঠকে আরও বলেন যে, এটা হল ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। এর ফলে জনগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এটি উদ্বেগের বিষয়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এই তালিকা থেকে বাদ গিয়েছেন। এটা মানবিকতাকে ধ্বংস করবে।

তিনি বলেন, কমিশন সন্তুষ্ট না হওয়ায় আধার কার্ড ও পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও অনেক মানুষের নাম এই তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। পদবির ভিত্তিতেও অনেক নাম বাদ হয়েছে। উত্তর-পূর্বের সীমান্ত এলাকা জুড়ে থাকায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গকে এ ব্যাপারে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ-এর সঙ্গে কোনও আলোচনা ছাড়াই এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ করা হল। ৪০ লক্ষ হিন্দু-মুসলমানের নাম বাদ দেওয়া হল। ইন্টারনেট-সহ সমস্ত যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে যা দুর্ভাগ্যজনক। কেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হল ? আমরা তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করতে পারছি না। এটা কি তাঁদের বুলডোজ করার ব্যবস্থা?

আমরা মনে করছি যে এটা জোর করে মনুষ্যত্ব ও মানুষকে উপড়ে ফেলা বা উচ্ছেদ করার একটা পরিকল্পনা এবং ভোট রাজনীতি থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করার একটা প্রচেষ্টা। আমরা ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসিতে বিশ্বাস করি না। নবান্ন-এ রাজ্য সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এই কথাগুলো বলেন তিনি।

তিনি বলেন, তাঁরা অসম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা উদ্‌বাস্তুতে পরিণত হচ্ছেন। অনেকের ক্ষেত্রেই সমস্ত তথ্য-প্রমাণের নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও নাগরিকপঞ্জিতে তাঁদের নাম ওঠেনি, বাদ গিয়েছে। এমনকি ৫০-৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওখানে থাকার পরেও অনেকের নাম বাদ গিয়েছে। এটা হল জোর করে উচ্ছেদ করা।

সরকার কি একবারও ভেবেছে এই গৃহহারা লক্ষ লক্ষ মানুষ কোথায় যাবেন? তাঁদের জন্য সরকার কি কোনও পুনর্বাসন প্যাকেজের কথা ভেবেছে? বাংলাকেই এর জন্য সমস্যায় পড়তে হবে। পদবীর ভিত্তিতেও নাম বাদ হল। অথচ তাঁদের সেখানে বাড়ি আছে। তাঁরা অসমের বাসিন্দা। কিন্তু কেন তাঁদের উচ্ছেদ করা হল? তিনি এসব প্রশ্ন তোলেন।

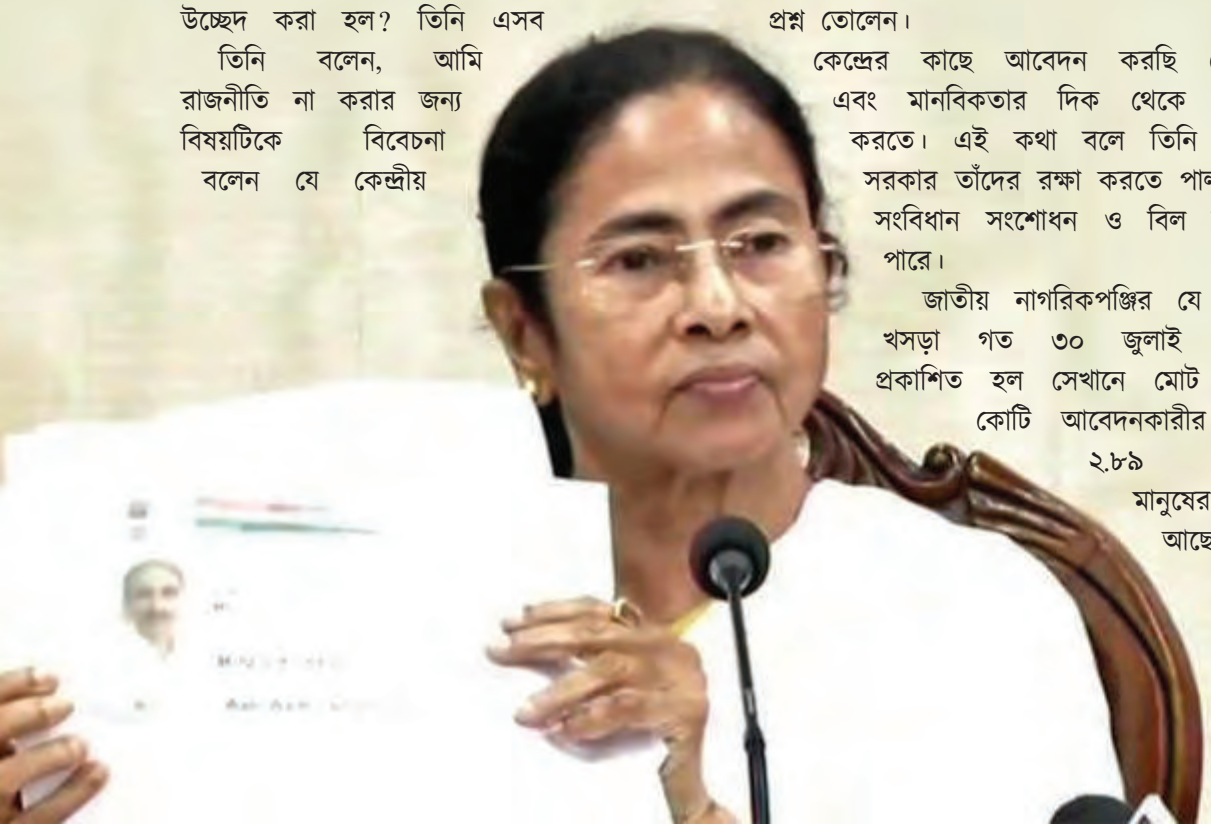

তিনি বলেন, আমি রাজনীতি না করার জন্য বিষয়টিকে বিবেচনা করতে। এই কথা বলে তিনি আরও বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের রক্ষা করতে পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধন ও বিল আনতে পারে।

জাতীয় নাগরিকপঞ্জির যে চূড়ান্ত খসড়া গত ৩০ জুলাই অসমে প্রকাশিত হল সেখানে মোট ৩.২৯ কোটি আবেদনকারীর মধ্যে ২.৮৯ কোটি মানুষের নাম আছে।

বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ

নাগরিকপঞ্জি: অসমে ভারতীয় নাগরিকদের উদ্বাস্তু করার চক্রান্ত প্রত্যাহার করুক কেন্দ্র

অসম-এ ৪০ লাখেরও বেশি মানুষ, যারা মূলত বাংলাভাষী তাঁদের নাম জাতীয় নাগরিকপঞ্জিতে অর্ন্তভুক্ত না হওয়ার বিরোধিতা করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কোনও সংশোধনী ছাড়াই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ৩১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রস্তাবটি পেশ করেন রাজ্যের পরিষদীয় এবং বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাবে বলা হয়, অসমে ভারতীয় নাগরিকদের অমর্যাদা করা হচ্ছে। ৪০ লাখ ৭০ হাজার ২১ জন অর্থাৎ অসমে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রায় ২০-২৫ শতাংশ মানুষের নাম অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরির নামে বাদ দেওয়ার বিষয়টিকে এই সভা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করেছে। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নিয়মাবলী ও কার্য প্রণালীর রুল ১৮৫ অনুসারে কেন্দ্রের এই বঞ্চনার বিষয়ে প্রস্তাবটি আনা হয়।

আধার কার্ড থাকা সত্ত্বেও নাগরিকপঞ্জিতে, ধর্ম ও ভাষাগত সংখ্যালঘু এবং বিশেষ করে বাঙালিদের নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি অমানবিক স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। মানবিকতাকে ধ্বংস করার এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই সভায় প্রতিবাদ জানানো হয়।

ভারতের যে কোনও জায়গায় ভারতীয় নাগরিকদের বসবাসের অধিকার থাকা সত্ত্বেও অসমের এই ভারতীয় নাগরিকদের অমর্যাদা করা হচ্ছে, নিজ দেশে পরবাসীর তকমা দেওয়া হচ্ছে, উদ্‌বাস্তু হতে হচ্ছে এবং নিজেকেই প্রমাণের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে যে সে অভিযুক্ত নয় যা অনৈতিক। এর ফলে নাগরিক পঞ্জির নামে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তারা এক ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন।

গভীর উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে এই অমানবিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বৈধ ভারতীয় নাগরিকদের উদ্‌বাস্তু করার চক্রান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

রাজ্যের ন্যায্য বরাদ্দ অর্থ মিটিয়ে দিক কেন্দ্র

রাজ্যের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে দাবি জানানোর ক্ষেত্রে প্রস্তাব পাশ হল বিধানসভায়। ৩১ জুলাই বিধানসভায় কোনও সংশোধনী ছাড়াই এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নানা প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিক। একইসঙ্গে রাজ্য থেকে কর বাবদ সংগৃহীত অর্থের ৫০ শতাংশ রাজ্যের অংশ হিসেবে সেই রাজ্যকে দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কারণ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করছে না এবং রাজ্য সরকারের প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে বঞ্চিত করছে। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়, রাজ্যের প্রতি আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক ভূমিকা পালন করছে না।

বিধানসভায়, অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিষয়ে প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী তথা বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাবনা পাশের পর তিনি বলেন, আসুন, আমরা এক হয়ে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিষয়ে একমত হই। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নিয়মাবলী ও কার্য প্রণালীর রুল ১৮৫ অনুসারে কেন্দ্রের এই বঞ্চনার বিষয়ে প্রস্তাবটি আনা হয়।

এই প্রস্তাবনার মূল বিষয়বস্তু ছিল :-

- ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করছে না এবং রাজ্য সরকারের প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও বঞ্চিত করছে।
- ভারতীয় সংবিধানের ২৮০ অনুচ্ছেদ অনুসারে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে এবং এই কমিশন রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় করের বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে পরামর্শ নিচ্ছে।
- পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্স-এ কর ইত্যাদি বাবদ সংগৃহীত অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিবর্ষ ১৯৭১-এর পরিবর্তে ২০১১ ধার্য করা হয়েছে। এর ফলে অনেক রাজ্য বহুলাংশে বঞ্চিত হবে।
- রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় কর বাবদ সংগৃহীত অর্থের ৫০ শতাংশ রাজ্যে অংশ হিসেবে রাজ্যগুলিকে প্রদানের দাবি বহু দিনের এবং এ বিষয়ে এই সভায় আগেও সদর্থক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু উক্ত অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে না।
- সেজন্য এইদিন বিধানসভায় প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে অর্থ বরাদ্দের ভিত্তিবর্ষ অপরিবর্তিত রাখা-সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবি জানানো হয়।

সংবাদ

২২/০৫/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী এদিন জানান তিনি তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে, স্টারলাইটের ঘটনার খবর পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। মুখ্যমন্ত্রী গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন তুতিকোরিনে নিহত পরিবারের প্রতি। আহতদের দ্রুত সুস্থ ওঠার জন্য প্রার্থনা করেন তিনি।

২৩/০৫/২০১৮

রাজ্যের জয়েন্ট-এন্ট্রাস, ২০১৮ পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সদ্য নির্বাচিত কর্ণাটকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নব গঠিত সরকারের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন অনুষ্ঠান ২০১৮। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এছাড়া বাংলাদেশ ও ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সমাবর্তনে পদক ও শংসাপত্র প্রাপকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বিশ্বভারতীর সকল ছাত্র-ছাত্রী, প্রাক্তনী, শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের শুভেচ্ছা জানান। এদিন বিশ্বভারতী প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ ভবন–এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, এই ভবন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেকার বন্ধুত্বের বন্ধনের এবং সৌভ্রাতৃত্বের নয়া মাইল ফলক।

২৮/০৫/২০১৮

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এদিন নবান্নে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য কমিশনের কাছে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা হয়।

চারদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে কালিম্পং পৌঁছালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

২৯/০৫/২০১৮

দার্জিলিং ও কালিম্পং-র ১৫টি জনজাতির উন্নয়ন বোর্ডের বৈঠকে মমতা ব্যানার্জ্জী সভামুখ্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। নানান জনজাতির উপচে পড়া ভিড়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় কালিম্পং-র ডঃ গ্রাহামস হোমের জার্ভি হলে। এদিন বিভিন্ন জনজাতি উন্নয়ন বোর্ডের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয় আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়নের লক্ষ্যে। আবাসন, রাত্রিকালীন বিদ্যালয়, হোস্টেল এবং জনজাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা পেলেন সকল জনজাতির মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে পাহাড়ের ভাই-বোনেদের মুখে হাসি দেখতে তিনি ভালবাসেন এবং এই হাসি স্থায়ী করে রাখার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী এদিন কালিম্পং-এ জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করেন। পাহাড়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে অর্থনীতির ভিতকে আরও মজবুত করতে মূলত যে বিষয়গুলির উপর তিনি জোর দেন সেগুলি হল তথ্য প্রযুক্তি, কৃষি, উদ্যানপালন।

০১/০৬/২০১৮

আলিম, ফাজিল ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

০৫/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও বিভিন্ন হাসপাতালের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন নবান্ন সভাঘরে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল হকিকতের খোঁজ খবর নেন তিনি। সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসক নিয়োগের জন্যে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ নেওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

০৬/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ২০১৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের আগামী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সাফল্য কামনা করেন।

০৭/০৬/২০১৮

হাওড়া শরৎসদনে এক সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এদিন হাওড়া জেলার ঐতিহ্য বহনকারী একটি সংগ্রহশালার উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। হাওড়া অঞ্চলের ৫০০বছর পুরনো ঐতিহাসিক সামগ্রীসহ বহু বিখ্যাত মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রী দিয়ে সাজানো হয়েছে এই সংগ্রহশালা। বর্তমান প্রশাসনের সাত বছর পূর্তিতে প্রকাশিত বইটির উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী এদিন। এরপর হাওড়া জেলায় উন্নয়নের কাজ খতিয়ে দেখতে প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি।

০৮/০৬/২০১৮

দীর্ঘ তিন বছর প্রতীক্ষার পর বীরভূম জেলার দেওচা পাচামি কয়লাখনিতে খননকার্য চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রকের অনুমতি পাওয়া গেল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, ২,১০২ মিলিয়ন টন সংরক্ষণ ক্ষমতাবিশিষ্ট এই খনিটি কয়লা সংরক্ষণে বিশ্বে ২য় স্থানাধিকারী। বীরভূম ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে প্রায় এক লক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে এই খনন প্রকল্পে। এছাড়া এই প্রকল্পে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা লগ্নির সম্ভবনাও প্রবল, জানান মুখ্যমন্ত্রী। শুধুমাত্র বীরভূম বা প্রতিবেশী জেলাগুলিই নয়, সামগ্রিকভাবে গোটা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এই প্রকল্পের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। খননের কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পরিকাঠামোও তৈরি।

এদিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

০৯/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী এদিন জানান যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তপশিলী জাতি ও জনজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ মানের পেশাদার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল এন্ট্রান্সের পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান মোট ৯৩৯ জন ছাত্রছাত্রী চলতি বছরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। তার মধ্যে ৩৪৮ জন তপশিলী এবং ৭৬ জন জনজাতির ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিরিয়ারিং শাখায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথম ১০০০ জনের তালিকায় ৯৫ জন এই প্রশিক্ষণ শিবিরের ছাত্রছাত্রী স্থান পেয়েছে। মেডিক্যালের ক্ষেত্রে ১২৫ জন তপশিলী জাতি ও জনজাতির ছাত্রছাত্রী নিট (NEET) পরীক্ষায় সম্মমানে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী সফল ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি এদিন ঘোষণা করেন যে আগামী বছরের জন্য সরকারি উদ্যোগে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যাতে সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে আগামী দিনে রাজ্যের অনেক বেশি সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী পেশাদারি শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারবে।

১০/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী জানিয়েছেন যে রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নে গতি এসেছে। তিনি বলেন যে ২০১১ সালের তুলনায় ‘প্রকৃত পরিকাঠামো উন্নয়ন’ (PHYSICAL INFRASTRUCTURE) প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি

পেয়েছে । সম্প্রতি রাজ্য সরকার ১৮ হাজার কোটি টাকার পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ করেছে। উড়ালপুল, গ্রামীন ও পুর এলাকায় পানীয় জল-সরবরাহ, রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎ প্রকল্প, সাধ্যবিত্তের জন্য আবাসন, সেচ ইত্যাদি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ২৫,৭৫৫ কোটি টাকা (CAPITAL EXPENDITURE) এই অর্থ ব্যয় করা হবে চলতি আর্থিক বর্ষে। এছাড়া, পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে নিশ্চিত ভাবেই রাজ্যে কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পাবে।

১১/০৬/২০১৮

বোর্ড পরীক্ষা ২০১৮-র সেরার সেরাদের সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন নেতাজি ইন্‌ডোর স্টেডিয়ামে কৃতীদের হাতে পুরস্কার ও সংশাপত্র তুলে দেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষক ও পরিবারকেও শুভেচ্ছা জানান তিনি।

১২/০৬/২০১৮

আলিম, ফাজিল ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা, ২০১৮-র কৃতীদের নবান্নে সংবর্ধনা জানালেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষক অথবা আইএএস, আইপিএস, ডব্‌লিউবিসিএস পদে কাজ করার ইচ্ছাকে সাধুবাদ জানিযান তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবার, শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও শুচেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

গুরুত্বপূর্ণ দশটি মন্ত্রকে, যুগ্মসচিব পদে সরাসরি বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রতিভাবান পেশাদারদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই নিয়োগ নিয়ে বৃহত্তর পর্যালোচনার দাবি করে সামাজিক মাধ্যমে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। তিনি বলেন যে প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বাড়াতে এই নিয়োগে অনেকে মনে করতে পারেন যে আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর মতে, বর্তমানে যে সকল সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা কাজ করছেন, তাঁরা ইউপিএসসির মত সংবিধান স্বীকৃত সংস্থার স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে নিযুক্ত। কর্মক্ষেত্রে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ বলেই মনে করা হয়। নয়া পদ্ধতিতে যুগ্ম সচিব স্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে তা দেশের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে এই বলে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি দেন।

১৬/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী কলকাতার রেড রোডে ঈদের নমাজ উপলক্ষে এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। রমজানের শেষে খুশির ঈদের দিনে উপস্থিত সকলকে এবং রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান।

১৭/০৬/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেন। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ন্যায্য বকেয়া অর্থের দাবী তোলেন। এছাড়া তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও কেরালার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে একযোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেন অবিলম্বে দিল্লি সরকার ও লেফটানেন্ট গভর্নর –এর মধ্যে চলা সাংবিধানিক সংকট নিরসনে কেন্দ্র যথাযথ পদক্ষেপ করুক।

১৯/০৬/২০১৮

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর। আগামী বছর জানুয়ারি মাস থেকে ১৮ শতাংশ বর্ধিত হারে ডি এ পাচ্ছেন তাঁরা। এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরাও এই সুবিধা পাবেন।

২২/০৬/২০১৮

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক বিভাগের সঙ্গে একটি বিনিময় কর্মসূচিতে অংশ নিতে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে চলতি বছরের মার্চ মাসে তাঁকে অনুরোধ করা হয়, জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। দেশে স্বার্থেই তিনি বিদেশমন্ত্রীর এ প্রস্তাবে সম্মত হন এবং জুনের শেষ সপ্তাহে চীন সফরের সিদ্ধান্ত নেন। চীন ও

ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পেলে দু'দেশের স্বার্থই রক্ষিত হবে। সেই মর্মে একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে চীনে যাওয়া স্থির হয়। শেষ পর্যায়ে এসে চীনের রাজনৈতিক বৈঠকগুলি হওয়ার বিষয়ে চীন সরকারের তরফে কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায় নি। এমন পরিস্থিতিতে এই সফর অর্থহীন হয়ে পড়ে। ফলে সফর বাতিল করা ছাড়া উপায় ছিল না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তবে, ভবিষ্যতে চীন-ভারতের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বিষয়ে আশাবাদী তিনি।

০২/০৭/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী আচমকা পরিদর্শনে করেন দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজে। সম্প্রতি বিভিন্ন কলেজে ভর্তি নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। পুলিশ-প্রশাসনকে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে চলা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। গ্রেপ্তার হয় কয়েকজন। এদিন আশুতোষ কলেজে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভর্তি হতে আসা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে ভর্তি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কলেজের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ভর্তির অনলাইন ডেস্কে গিয়ে নিজে সরেজমিনে দেখেন ভর্তি পদ্ধতি।

০৪/০৭/২০১৮

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী এদিন জানিয়েছেন যে রাজ্য সরকার ও ব্রিটিশ কাউন্সিল একটি মউ (MOU) স্বাক্ষর করতে চলেছে। আগামীদিনে চুক্তি মোতাবেক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলা ও ব্রিটেন এক সাথে কাজ করবে। দুর্গা পূজা ও টেমস উৎসবকে মেলানোর প্রক্রিয়ার পাশাপাশি কলকাতায় টেমস উৎসবের মতো একটি উৎসব হবে। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্র খোলা হবে পর্যটনকে ঘিরে। এছাড়া, যুব সম্প্রদায়ের কাছে নতুন কর্ম সংস্থানের দিশা দিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। যেমন, ইংরেজিতে কথা বলার জন্য দক্ষ করে তোলা। এর ফলে বহু যুবক-যুবতী উপকৃত হবে। মৌ স্বাক্ষর করার সময় উপস্থিত ছিলেন, ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধিকর্তা অ্যালেন গ্যাম্মেল। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী যখন ইংল্যান্ড সফরে গেছিলেন তখন এই বিষয়টি উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্লোবাল ডেপুটি চেয়ারপার্সন ব্যারোনেস ঊষা প্রসার নিজে উদ্যোগ নেন এই মউ স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে।

০৫/০৭/২০১৮

এদিন ব্যয় সংকোচন নিয়ে নবান্নে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। বৈঠকশেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সরকারি টাকার অপচয় রুখতে পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার, তবে এই ব্যয় সংকোচের প্রভাব কোনও অবস্থাতেই উন্নয়নে বাধা হবে না। কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজ সাথীর মতো জন পরিষেবার কাজে খরচ নিয়ে কোনও সমঝোতা করা হবে না, কারণ সরকারি টাকা আসলে মানুষেরই টাকা।

০৬/০৭/২০১৮

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জনজাতি সংগঠনের নেতাদের নিয়ে নবান্ন-সভাঘরে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। জনজাতি উন্নয়ন প্রসঙ্গে জনজাতি সংগঠনের তরুণ নেতৃত্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত এদিন সাদরে গ্রহণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, সকল জনজাতির সার্বিক উন্নয়নে তৎপর রাজ্য সরকার। এ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

ফটোফিচার

৫/৬/২০১৮

স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-সহ স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭/৬/২০১৮

প্রশাসনিক বৈঠকে হাওড়া শরৎ সদনে মুখ্যমন্ত্রী। নতুন রাজ্য সরকারের ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করেন তিনি।

১২/৬/২০১৮

২০১৮ সালের মাদ্রাসা ও হাই মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় রাজ্যের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে।

১৩/৬/২০১৮

নবান্নে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্‌বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২/৬/২০১৮

নবান্নে দমকল পরিষেবার উদ্‌বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩০/৬/২০১৮

হুল দিবস পালন।

ছবি: প্রতীক শেঠ ও সঞ্জয় সমাদ্দার

৫/৭/২০১৮

অর্থনীতি নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সভাগৃহে।

৬/৭/২০১৮

কয়েকটি থানা, থানার নতুন ভবন এবং পুলিশ কর্মচারী আবাসনের উদ্‌বোধনে মুখ্যমন্ত্রী।

১৯/৭/২০১৮

মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহ-ভালবাসার পরশ। একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের সভামঞ্চ ভেঙে যাওয়ায় বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। মেদিনীপুর হাসপাতালে সেই আহতদের দেখতে পৌঁছে গেলেন তিনি।

২০১৮-র স্কচ পুরস্কারে দেশের সেরা বাংলা

দেশের সেরার শিরোপা ফের পশ্চিমবঙ্গের মুকুটে। সমাজসেবা থেকে সরকারি বা পরিষেবামূলক প্রকল্পে ফের দেশকে পথ দেখাল পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আবার প্রমাণিত হল, পশ্চিমবঙ্গ আজ যা ভাবে — ভারতবর্ষ কাল তা করে। বাংলার নানা উদ্ভাবনী প্রকল্প যে আজ গোটা দেশের মডেল হতে পারে, ২০১৮-র স্কচ অ্যাওয়ার্ড তারই প্রমাণ। উল্লেখ্য, দেশের কোনও রাজ্য-এর আগে একসঙ্গে এতগুলি ক্যাটিগরি-তে সম্মান পায়নি। ফলে স্কচ ফাউন্ডেশনের নিরিখে এটা রেকর্ডও বটে।

কী এই স্কচ অ্যাওয়ার্ড? ১৯৯৭ সাল থেকে পথ চলতে শুরু করা স্কচ গ্রুপ সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট। বই, জার্নাল প্রকাশ করা কিংবা ওয়ার্কশপের পাশাপাশি স্কচ গ্রুপ সামাজিক এবং পরিষেবামূলক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রতিবছর নানা রাজ্যের সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত করে। এ বছর স্কচ পুরস্কারে বহু প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ দেশের সেরা হওয়ায় প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

“পারফরম্যান্স ও পরিকল্পনা রূপায়ণে বাংলা আবার সাফল্যের শীর্ষে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় স্কচ অ্যাওয়ার্ড আমরা পেয়েছি। এই সাফল্যের জন্য সকলকে অভিনন্দন।”

—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল সিগনিফিক্যান্স অ্যাওয়ার্ড

১	পশ্চিমবঙ্গ	স্টেট অব দ্য ইয়ার	প্ল্যাটিনাম	নগরোন্নয়ন
২	পশ্চিমবঙ্গ	স্টেট অব দ্য ইয়ার	প্ল্যাটিনাম	গ্রামোন্নয়ন
৩	পশ্চিমবঙ্গ	স্টেট অব দ্য ইয়ার	প্ল্যাটিনাম	অর্থ
৪	পশ্চিমবঙ্গ	স্টেট অব দ্য ইয়ার	প্ল্যাটিনাম	পর্যটন ও সংস্কৃতি

স্টেট অব দ্য ইয়ার পুরস্কারে সম্মানিত করার অর্থ জাতীয় তাৎপর্যের বিচারে এই চারটি দপ্তরেই সেরা বাংলা।

স্কচ প্ল্যাটিনাম পুরস্কার প্রাপক

নগরোন্নয়ন বিভাগ ১) আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ADDA অনলাইন	*প্ল্যাটিনাম*
গ্রামোন্নয়ন ২) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ প্রকল্প, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	জি আই ভিত্তিক সুসংহত প্ল্যানিং ও মনিটরিং	*প্ল্যাটিনাম*
৩) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলিগুড মিশন ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	স্কুল ছাত্রছাত্রীদের পোশাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন [শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯]	*প্ল্যাটিনাম*
অর্থ ও আয় ৪) ডাইরেক্টরেট অব পেনশন—প্রভিডেন্ট ফান্ড—গ্রুপ ইনশিয়োরেন্স, অর্থ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ই-পেনশন [http://wbepension.gov.in]	*প্ল্যাটিনাম*
পর্যটন ও সংস্কৃতি ৫) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	লোক প্রসার প্রকল্প	*প্ল্যাটিনাম*

লোক প্রসার প্রকল্পের জন্য স্কচ পুরস্কার গ্রহণ করছেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব বিবেক কুমার এবং তথ্য অধিকর্তা মিত্র চ্যাটার্জী।

স্কচ স্বর্ণ পদক প্রাপক

১) বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন	গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	*স্বর্ণ*
২) ওয়েবেল ইনফরমেটিক্স লিমিটেড, তথ্য প্রযুক্তি বৈদ্যুতিন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে তথ্য প্রযুক্তি প্রকল্প চালু	*স্বর্ণ*
৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার মনিটরিং পদ্ধতি	*স্বর্ণ*
৪) নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	কলকাতায় 'সবুজ অঞ্চল' তৈরি	*স্বর্ণ*
৫) পরিবহণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	গতিধারা	*স্বর্ণ*
৬) ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	প্রতি জেলায় ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প সহায়তা কেন্দ্র	*স্বর্ণ*
৭) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ প্রকল্প, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	আইএসজিপি-২ প্রকল্পের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফিল্ড কর্মীদের জিপিএস প্রযুক্তির সহায়তা প্রাপ্ত ই-হাজিরা চালু	*স্বর্ণ*
৮) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ প্রকল্প, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	গ্রাম বাংলার মানুষের জন্য ই-গ্রিভ্যান্স ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি চালু	*স্বর্ণ*
৯) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	আনন্দধারা প্রকল্পে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ক্রেডিট সংযুক্তিকরণ	*স্বর্ণ*
১০) কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার এবং ই-গভর্ন্যান্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	রেডিও তরঙ্গ নির্ভর ট্যাক্সি ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি	*স্বর্ণ*
১১) ওয়েবেল ইলেকট্রনিক্স শিল্পোন্নয়ন নিগম, তথ্য প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	মাটির কথা	*স্বর্ণ*

স্কচ রৌপ্য পদক প্রাপক

১) পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন	বৃক্ষপাট্টা প্রদান	*রৌপ্য*
২) কোচবিহার জেলা প্রশাসন	গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	*রৌপ্য*
৩) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন	বংশীহারির মহিলাদের আলো প্রকল্পে উত্তরণের স্বীকৃতি	*রৌপ্য*
৪) জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন	অভিনব পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট জেলায় জীবনধারণের মানোন্নয়ন	*রৌপ্য*
৫) স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	জন অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতির সূচনা (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এসট্যাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন)	*রৌপ্য*
৬) নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	জয়গাঁও-তে সোলার এলইডি আলো বসানো	*রৌপ্য*
৭) নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	পুরুলিয়ার সুভাষ পার্কের পুনর্নবীকরণ এবং সাহেব বাঁধ-এ ইকো টুরিজম কমপ্লেক্স-এর পুনঃসংস্কার	*রৌপ্য*
৮) ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	SWAS (সার্ভিস উইথ এ স্মাইল — service with a smile) — মোবাইল অ্যাপস চালু এবং আধুনিক হেল্‌প ডেস্ক-এর ব্যবস্থা	*রৌপ্য*
৯) পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ প্রকল্প— জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ক্ষুদ্র সেচ পরিকাঠামোর পরিকল্পনা, গঠন এবং সার্বিক দেখাশোনার জন্য ই-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট	*রৌপ্য*

স্পেশাল মেনশন স্কচ অ্যাওয়ার্ড

১) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ প্রকল্প	*প্ল্যাটিনাম*
২) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলি হুড মিশন	*প্ল্যাটিনাম*
৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	—	*স্বর্ণ*
৪) নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	—	*স্বর্ণ*
৫) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ	—	*স্বর্ণ*

স্কচ অর্ডার অব মেরিট

১) ডাইরেক্টরেট অব পেনশন—প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্রুপ ইনশিয়োরেন্স, অর্থ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ই-পেনশন [http://wbpension.gov.in]	*স্বর্ণ*
২) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ প্রকল্প, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	জিআই-ভিত্তিক সুসংহত প্ল্যানিং ও মনিটরিং	*স্বর্ণ*
৩) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ প্রকল্প, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	আইএসজিপি-২ প্রকল্পের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফিল্ড কর্মীদের জিপিএস প্রযুক্তি সহায়তা প্রাপ্ত ই-হাজিরা চালু	*স্বর্ণ*
৪) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাতিষ্ঠানিক সশক্তিকরণ প্রকল্প, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	গ্রামবাংলায় মানুষের জন্য ই-গ্রিভ্যান্স ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি চালু	*স্বর্ণ*
৫) সোসাইটি ফর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গোয়েজ টেকনোলজি রিসার্চ, তথ্য-প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	বাংলা ভাষার ডিজিটাল আর্কাইভ	*স্বর্ণ*
৬) পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ প্রকল্প জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ক্ষুদ্র সেচ পরিকাঠামোর পরিকল্পনা, গঠন এবং সার্বিক দেখাশোনার জন্য ই-প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট	*স্বর্ণ*
৭) ওয়েবেল ইলেকট্রনিকস শিল্পোন্নয়ন নিগম, তথ্য প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ	মাটির কথা	*স্বর্ণ*
৮) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলি হুড মিশন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	আনন্দধারা প্রকল্পে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের ক্রেডিট সংযুক্তিকরণ	*স্বর্ণ*
৯) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	স্কুল ছাত্রছাত্রীদের পোশাক দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন [শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯]	*স্বর্ণ*
১০) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	জন অভিযোগ প্রতিবিধান পদ্ধতির সূচনা (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এসট্যাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন)	*রৌপ্য*
১১) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	লোকপ্রসার প্রকল্প	*রৌপ্য*
১২) ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	প্রতি জেলায় ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্প সহায়তা কেন্দ্র	*রৌপ্য*
১৩) বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন	অপুষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও সমাপ্তির মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	*রৌপ্য*
১৪) জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন	জেলার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	*রৌপ্য*
১৫) পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন	বৃক্ষ পাট্টা প্রদান	*রৌপ্য*
১৬) আইন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	'সার্থক' (SARTHAC) প্রকল্প	*রৌপ্য*

১৭) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	গ্রামোন্নয়নে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	*রৌপ্য*
১৮) নগরোন্নয়ন ও পুর বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	কলকাতায় 'সবুজ অঞ্চল' তৈরি	*রৌপ্য*
১৯) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন নিগম লিমিটেড	অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে 'ইনটেলেকচুয়াল বিলিং' চালু	*রৌপ্য*
২০) আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন নিগম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ADDA অনলাইন	*ব্রোঞ্জ*
২১) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার মনিটরিং পদ্ধতি	*ব্রোঞ্জ*
২২) বৈধ পরিমাপক অধিকার, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার মনিটরিং পদ্ধতি	*ব্রোঞ্জ*
২৩) বীরভূম জেলা প্রশাসন	জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, শান্তি	*ব্রোঞ্জ*
২৪) পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন	গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন	*ব্রোঞ্জ*
২৫) পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন	পর্যটন পুরুলিয়া	*ব্রোঞ্জ*
২৬) সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	বিভিন্ন শিল্প ও কলকারখানাকে অনলাইনে অনুমতি প্রদান	*ব্রোঞ্জ*
২৭) কর্মীবর্গ প্রশাসন ও ই-গভর্ন্যান্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	রেডিও-তরঙ্গ নির্ভর ট্যাক্সি ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি	*ব্রোঞ্জ*
২৮) পরিবহণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ইন্টিগ্রেটেড স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট	*ব্রোঞ্জ*
২৯) পরিবহণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	গতিধারা	*ব্রোঞ্জ*
৩০) নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	জয়গাঁও-তে সোলার এলইডি আলো বসানো	*ব্রোঞ্জ*
৩১) নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	অনলাইন ওয়েবপোর্টাল এবং মোবাইল অ্যাপ	*ব্রোঞ্জ*
৩২) নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	সমব্যথী	*ব্রোঞ্জ*
৩৩) ওয়েবেল ইনফরমেটিক্স লিমিটেড, তথ্য প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ইলেকট্রনিক ব্রেইল রিডিং পদ্ধতি	*ব্রোঞ্জ*
৩৪) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ	এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম	*ব্রোঞ্জ*
৩৫) ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	SWAS (সার্ভিস উইথ এ স্মাইল—service with a smile) মোবাইল অ্যাপস চালু এবং আধুনিক হেল্প ডেস্ক এর ব্যবস্থা	*তাম্র*
৩৬) কোচবিহার জেলা প্রশাসন	জেলার জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন	*তাম্র*
৩৭) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন	মহিলা সভা গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন	*তাম্র*
৩৮) দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন	বংশীহারির মহিলাদের আলো প্রকল্পে উত্তরণের স্বীকৃতি	*তাম্র*
৩৯) পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন	—	*তাম্র*
৪০) কেএমডিএ	ভাসমান বাজার, পাটুলি	*তাম্র*
৪১) নগরোন্নয়ন ও পুর বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	পুরুলিয়ার সুভাষ পার্কের পুনর্নবীকরণ ও সাহেব বাঁধ-এ ইকো টুরিজম কমপ্লেক্স সংস্কার	*তাম্র*

কৃতীদের পাঠ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

জীবন গড়তে পাশে থাকবে রাজ্য সরকার

২৪৮ জন মেধাবীর অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার করে টাকা

কৃতীদের সঙ্গে কথা বললেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানলেন। এরপর তাঁদের জীবন গড়ার পাঠ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৮ সালের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তাঁর স্পষ্ট বার্তা, জীবন গড়তে পাশে থাকবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, জীবনে যে মা প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁকে কখনও ভুলবে না। জীবনে যে মাটিতে তোমরা বড়ো হয়েছ, তাকে মনে রাখতেই হবে। আর কেরিয়ারে যাই হও না কেন, মানুষ হতে হবে। ১১ জুন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, দিল্লি বোর্ড এবং জয়েন্ট এন্ট্রান্সের কৃতীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, বক্তব্য রাখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কৃতীরা এদিন একদিকে যেমন উপহার পেল, তেমনি জানানো হল, ২৪৮ জন মেধাবীর অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার করে টাকা দেবে রাজ্য সরকার, ভবিষ্যতে পড়াশোনার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ১০ হাজার টাকা হয়তো কিছুই নয়। বড়ো হয়ে তোমরা ১০ কোটি টাকা রোজগার করবে। কিন্তু এই টাকাকে জীবন-শুরুর আমানত হিসেবে মনে করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে মুখ্যমন্ত্রী এদিন ল্যাপটপ, বই, ঘড়ি, কলম এবং কিছু মিষ্টি উপহার হিসেবে তুলে দেন। আপ্লুত কৃতীদের বক্তব্য, জীবনের প্রথম পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহের পরশ পাব, ভাবতেই পারিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, পড়তে চাইলে রাজ্য সরকার তোমাদের পাশে ছিল-আছে-থাকবে। স্কলারশিপ চাইলেও দেওয়া হবে। পাশাপাশি সল্টলেকের কাছে আইএএস-এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে পড়লে প্রত্যেক পড়ুয়ার সুবিধেই হবে। শিক্ষামন্ত্রীকে বলতাম, প্রতিযোগিতার বাজারে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যেন কম নম্বর না পায়, সেটা দেখবেন। সেটাই হয়েছে। কৃতী ছাত্রছাত্রীরা এদিন সংগীত পরিবেশনও করেন।

পাশাপাশি আলিম, ফাজিল, হাই মাদ্রাসার এবছরের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের নবান্নে সংবর্ধিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। ২১ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩ জন ছাত্রী। তাঁদের উদ্দেশ্য করে মুখমন্ত্রী বলেন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে ৩৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে। তাঁদেরও এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আরও পড়াশোনা করো। বড়ো হও। মানুষ হও। সরকার সর্বদা তোমাদের পাশে রয়েছে।

ছবি: সঞ্জয় সমাদ্দার

উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতায় কন্যাশ্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

১৬ মে, ২০১৮। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে এসে পৌঁছয় একটি চিঠি। বীরভূমের সাঁইথিয়ার দারপুর হাইস্কুলের এক 'কন্যাশ্রী' চিঠি পাঠায় মুখ্যমন্ত্রীকে, তার ভাষায় 'তিলোত্তমা কলকাতা' দেখার স্বপ্নের কথা জানিয়ে।

মাধ্যমিক শেষ। স্বপ্নপূরণের পয়সা নেই। ওই স্কুলের আরও ১৯ জন সহপাঠী কলকাতা ঘোরার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাল মুখ্যমন্ত্রীকে।

১

মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে তৎক্ষণাৎ নির্দেশ গেল জেলা নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরে, ওদের জন্য একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে।

২৭ মে, ২০১৮। কলকাতার উদ্দেশ্যে ওরা ২০ জন রওনা হল সেই সুদূর সাঁইথিয়া থেকে। ভোরে। সঙ্গে চারজন শিক্ষক এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের ২ জন প্রতিনিধি। কলকাতায় পৌঁছে গেলেন ওরা। প্রায় তখন সকাল ১০টা।

২

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে আইসক্রিমের ব্যবস্থা ছিল ওদের জন্য। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে দেখল একটি বাংলা শো— 'কসমিক কলিশন'। সায়েন্স সিটি-তে দেখল আর একটি শো। আর চড়ল রোপ-ওয়ে। মেট্রো চড়ার স্বাদও নিল। ভারতীয় যাদুঘর দেখল ঘুরে ঘুরে। রাজ্যের সচিবালয়, নবান্ন-ও দেখতে গেল ওরা।

৩

৪

(১) ও (৪) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সামনে ছাত্রীরা

(২) বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে ছাত্রীরা

(৩) মেট্রো রেল চড়ার আনন্দ নিয়ে মেট্রো স্টেশনে ছাত্রীরা

ওদের আনন্দ উপভোগের কোনও ত্রুটি যাতে না হয় সেদিকে ছিল বিশেষ নজর। ছিল নিরাপত্তার ব্যবস্থা। প্রখর রোদ এড়াতে বাতানুকূল গাড়িতে ওদের ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সঙ্গে ছিলেন মহিলা আধিকারিক। স্ন্যাক্স, লাঞ্চ এবং ডিনারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। সব ব্যয়ই বহন করে দপ্তর। রাত ১১টায় ওরা ফিরে গেল ওদের জায়গায়। আপ্লুত অভিভাবকেরা তাঁদের নিয়ে গেলেন বাড়িতে। কৃতজ্ঞতা জানালেন মুখ্যমন্ত্রীকে, তাঁদের সন্তানদের এই শিক্ষাগ্রহণ ও উপভোগের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। সত্যিই অভিনব ছিল এই আয়োজন।

(৫) ভারতীয় জাদুঘরে প্রকৃতির সবুজ গালিচায় বসে ছাত্রীরা

(৬) ও (৭) কলকাতার সায়েন্স সিটি-র সামনে ওরা

(৮) ঘরে ফেরার পথে পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে ডিনার টেবিলে

দপ্তর কথা

নতুন রাজ্য সরকারের সাত বছর পূর্তি উপলক্ষে 'সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন' নামে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নিজের কলমে সেই রিপোর্টের কথামুখ প্রকাশিত হল এই সংখ্যায়।

কথামুখ

২০১১ সালের ২০ মে বাংলার জনগণ প্রতিষ্ঠা করেছিল মা-মাটি-মানুষের সরকার। এই সরকারের সাত বছর পূর্তিতে আমি অভিনন্দন জানাই বাংলার প্রতিটি মানুষকে। একটানা সাত বছর ধরে উন্নয়নের যাত্রাপথে তাঁরা মা-মাটি-মানুষের সরকারের উপরে আস্থা রেখেছেন, এর জন্য আমি রাজ্যের প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও। আপনাদের সেবায় নিজেদের উজাড় করে দিতে গিয়ে আমাদের সরকারের উপরে রাখা আপনাদের আস্থাই আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে প্রতিনিয়ত।

২০১১ সালে আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন বাংলার ছিল বেহাল দশা। বিপুল ঋণের ভারে রাজ্য ছিল জর্জরিত। এর ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজ্যের ভিত ছিল দুর্বল। সরকারে এসে আমাদের এখনও পর্যন্ত আসল ও সুদ মিলিয়ে ২ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে কেন্দ্রকে। এ ছাড়া কেন্দ্রের বিমুদ্রাকরণ বা নোটবন্দীর সিদ্ধান্ত

আমাদের রাজ্য তথা গোটা দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এনেছে চরম আঘাত। গরিব লোকের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লোকেরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তার সাথে যোগ হয়েছে তড়িঘড়ি জিএসটি চালু করার হঠকারী সিদ্ধান্ত, যা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং বাজার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে আমরা ছিলাম বদ্ধপরিকর। হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে রাজ্যকে নতুন দিশা দেখানোই ছিল আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। রাজ্যের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রতিটি পরিসরে রাজ্যকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে মা-মাটি-মানুষের সরকার কাজ করে চলেছে নিরলসভাবে। এই সরকারের সময়ে গ্রাম থেকে শহর, পাহাড় থেকে সমতল এবং সমুদ্র থেকে জঙ্গল, রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে উন্নয়নের আলো। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবার মত প্রতিটি ক্ষেত্রে এই রাজ্য সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে দুরন্ত গতিতে।

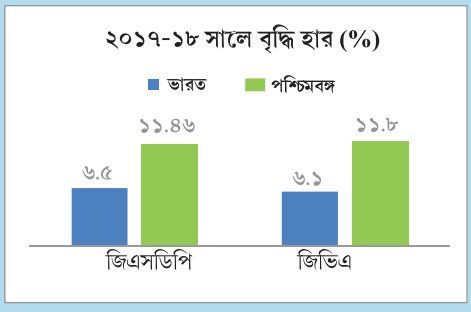

রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন (জিএসডিপি) বৃদ্ধি (কোটি টাকায়)

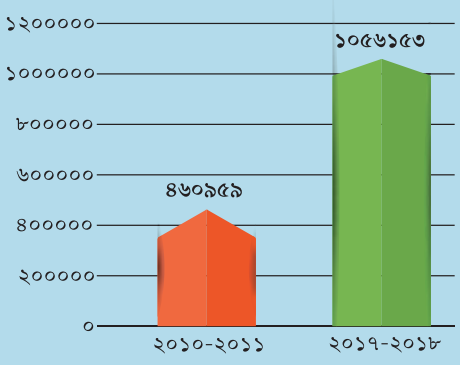

জীবনের প্রতিটি ধাপে সব দরকারে পাশে আছে সরকার

রাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই গত ৭ বছর ধরে সরকারি বিভিন্ন পরিষেবার সুবিধা লাভ করেছে। জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে রাজ্যের মানুষের সব রকমের দরকারে পাশে আছে আমাদের সরকার। মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের শুরু করা বিভিন্ন প্রকল্প আজ পথ দেখাচ্ছে গোটা দেশকে।

গত ৭ বছরে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন (জিএসডিপি) দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের জিএসডিপি ১১.৪৬% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১৭-১৮) যা ভারতের সার্বিক বৃদ্ধির হারের থেকে অনেক বেশি।

এ ছাড়া রাজ্যের নিজস্ব কর সংগ্রহের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে গত ৭ বছরে। এ ছাড়া বাহ্যিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যয় প্রায় চার গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সময়ে ৯০ লক্ষেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ।

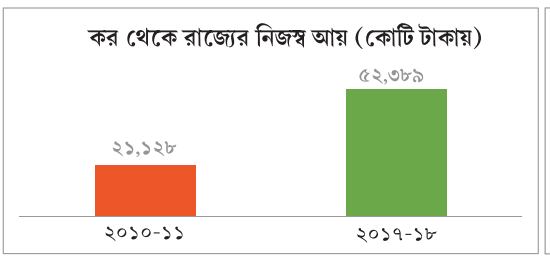

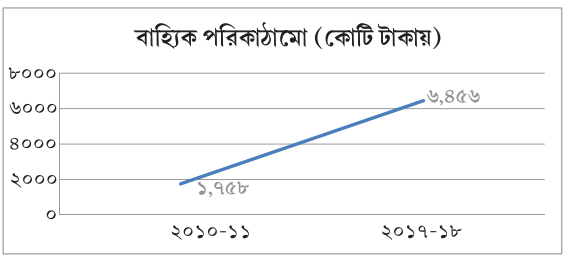

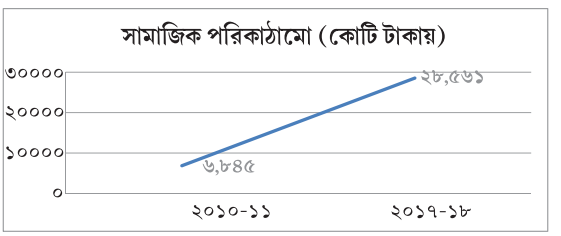

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে বাংলা

মা-মাটি-মানুষের সরকারের সফল পরিচালনায় উন্নয়নের নিম্নলিখিত যেসব ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে আমাদের বাংলা।

- ১০০ দিনের কাজে শ্রমদিবস সৃষ্টি এবং মোট টাকা খরচে প্রথম স্থান
- গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং গৃহ নির্মাণে প্রথম স্থান
- সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ এবং সংখ্যালঘু ঋণ প্রদানে প্রথম স্থান
- ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে প্রথম স্থান
- দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রথম স্থান
- 'ইজ অব ডুইং বিজনেস' - এ প্রথম স্থান
- কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক কাজের বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম স্থান

বাংলার সাফল্য এবং স্বীকৃতি

আমাদের সরকারের শুরু করা বিভিন্ন প্রকল্প লাভ করেছে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্বীকৃতি ও পুরস্কার।

- রাজ্যের যুগান্তকারী 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প ২০১৭ সালে ইউনাইটেড নেশনস-এর পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-এ প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে, যা শুধু রাজ্য নয়, দেশেরও গর্ব। এ ছাড়াও এই প্রকল্প পেয়েছে দেশ-বিদেশের নানা পুরস্কার।
- মিশন নির্মল বাংলা-র মাধ্যমে এই রাজ্যের নদিয়া জেলা দেশের প্রথম নির্মল জেলা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং ইউনাইটেড নেশনস কর্তৃকও স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ছাড়াও হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, কোচবিহার, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও হাওড়া নির্মল জেলা ঘোষিত হয়েছে।
- রাজ্যের দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এবং সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক ইউনেস্কো-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের স্বীকৃতি পেয়েছে।
- ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলা নজর কেড়েছে গোটা বিশ্বের। ফিফা আন্ডার ১৭ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই রাজ্যেই।

এ ছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভিন্ন গৌরবময় পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে এই রাজ্য। যেমন :

- কন্যাশ্রী প্রকল্পের 'ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স' অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি
- পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভূমিকাকে ভারত সরকারের স্বীকৃতি
- স্বাস্থ্য পরিষেবায় ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান/রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী দৃষ্টান্ত ও জেলা স্তরের নীচে ক্রিটিক্যাল কেয়ার পরিষেবার জন্য 'স্কচ স্মার্ট গভর্ন্যান্স অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্তি
- কৃষিতে পরপর ৫ বার 'কৃষি কর্মণ' পুরস্কার প্রাপ্তি
- তিন বছর 'অল ইন্ডিয়া স্কিল কম্পিটিশন'-এ সর্বোত্তম রাজ্যের স্বীকৃতি
- তাঁতজাত বস্ত্র বিপণনে 'তন্তুজ' সংস্থার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি এবং 'নীতি (**NITI**) আয়োগ' - এর প্রশংসা প্রাপ্তি
- গ্রামীণ বিদ্যুদায়নের জন্য 'আইপিপিএআই' প্রদত্ত পুরস্কার
- শ্রম ক্ষেত্রে 'স্কচ স্মার্ট গভর্ন্যান্স অ্যাওয়ার্ড'
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এই রাজ্যের ৬টি পৌরসভার 'ইন্টারন্যাশনাল সি-৪০ অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্তি
- সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে এক বছর পশ্চিমবঙ্গের 'ছৌ নৃত্য' ও অন্য বছর 'বাংলার বাউল' ট্যাবলোর প্রথম স্থান প্রাপ্তি

অনায়াসে বাণিজ্য (ইজ অব ডুইং বিজনেস)

বাণিজ্য-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে এই রাজ্য আজ দেশের মধ্যে প্রথম। লোড শেডিং ও বন্‌ধ আজ এই রাজ্যে ইতিহাস। ধর্মঘটের জন্য শ্রমদিবস নষ্টের সংখ্যা শূন্যে এসে ঠেকেছে। নতুন শিল্পের জন্য ল্যান্ড ব্যাংক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে রয়েছে পর্যাপ্ত জমি। নিউ টাউনে গড়ে তোলা হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার। এ বছর ১৬ ও ১৭ জানুয়ারিতে সেখানে অনুষ্ঠিত হওয়া চতুর্থ বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই সম্মেলনে ৩২টি দেশ থেকে ৪৫০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন এবং ১০৪৬টি B2B মিটিং, ৪০২টি B2G মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে ও ১১০টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্মেলনে এই রাজ্যে মোট ২,১৯,৯২৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে যা ২০ লাখেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর আর্থিক বিনিয়োগের এই প্রতিশ্রুতি বাংলাকে পৌঁছে দেবে এক নতুন উচ্চতায় যেখানে উন্নয়নের সুফল পাবে প্রতিটি মানুষ।

১৩ ও ১৪ মার্চ দার্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত প্রথম 'হিল বিজনেস সামিট' ওই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

কৃষিতে উন্নয়নের জোয়ার

বর্তমান সরকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যের কৃষকদের বার্ষিক গড় পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিন গুণেরও বেশি।

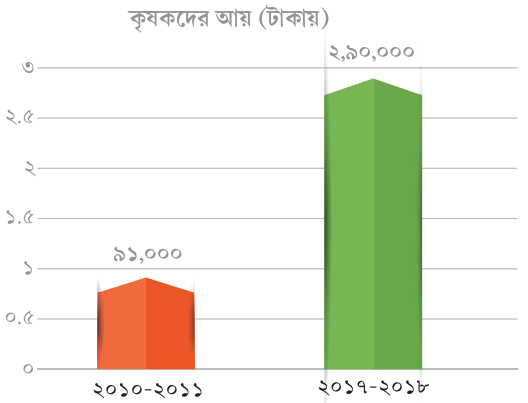

এই ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ—

- আমাদের সরকার কৃষি জমিতে খাজনা ও মিউটেশন ফি সম্পূর্ণ মকুব করেছে।
- ৬৯ লক্ষ কৃষককে কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- 'বাংলা ফসলবিমা যোজনা'য় নিখরচায় সমস্ত কৃষকের ফসলবিমা করা হয়েছে।
- কৃষক বার্ধক্যভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে ১ হাজার টাকা এবং প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ১ লক্ষ হয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করেছে আমাদের সরকার।
- প্রতি বছর ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে নিহত কৃষকদের স্মরণে আমরা পালন করি 'কৃষক দিবস'।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের নতুন নজির

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এই সরকারের আমলে রাজ্যে এসেছে উন্নয়নের জোয়ার। এই ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ গুণেরও বেশি।

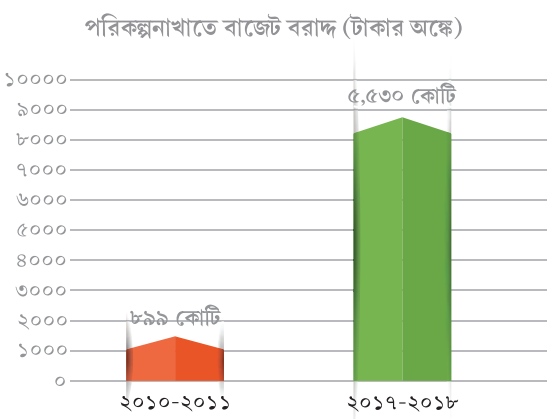

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু যুগান্তকারী উদ্যোগ নিয়েছি।

- গত সাত বছরে রাজ্যে ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া সকল সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা, রোগ নির্ণয় ও ওষুধপত্র প্রদান করা হচ্ছে।
- রাজ্যে ১১৫টি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান এবং ৮৮টি ন্যায্য মূল্যের রোগনির্ণয় কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে।
- দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই একমাত্র রাজ্য যেখানে মহকুমা স্তরেও সিসিইউ/এইচডিইউ চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যায়।
- গত সাত বছরে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার (২০০৭-০৯ সালের ১৪৫ থেকে কমে এখন ১১২) এবং শিশু মৃত্যুর হার (২০১০ সালের ৩২ থেকে কমে এখন ২৫) কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

শিক্ষার আলোয় আলোকিত বাংলা

রাজ্যে শিক্ষার উন্নতির জন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

- ২২টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ৪৮টি নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে। আরও ৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১৫৫টি নতুন আইটিআই ও ৮১টি পলিটেকনিক স্থাপন করা হয়েছে।
- ডায়মন্ড হারবারে নির্মিত হয়েছে পূর্ব ভারতের প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।
- উচ্চ শিক্ষায় সাধারণ আসন সংখ্যা না কমিয়ে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ১৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ৫৮ হাজার আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- কল্যাণী, কালিম্পং ও কার্শিয়াঙে এডুকেশনাল হাব তৈরি করা হচ্ছে। বোলপুরে তৈরি করা হচ্ছে নতুন বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তারকেশ্বরে খুব শিগগিরি তৈরি হবে নতুন গ্রিন ইউনিভার্সিটি। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে দার্জিলিঙের মংপুতে।

প্রগতি আর উন্নয়ন, সংখ্যালঘুর উত্তরণ

সংখ্যালঘু উন্নয়নে আমাদের সরকার বিশেষ মনোযোগী। এই ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ গুণেরও বেশি।

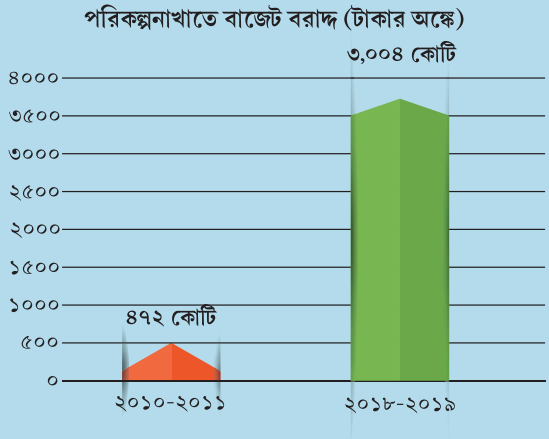

এ ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- ১ কোটি ৭১ লক্ষেরও বেশি সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয়েছে ৪ হাজার ২২১ কোটি টাকার স্কলারশিপ।
- নিউটাউন ও পার্ক সার্কাসে তৈরি হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস।
- স্বনিযুক্তির জন্য প্রায় ৮ লক্ষ মানুষকে ১৩০০ কোটি টাকারও বেশি ঋণ প্রদান করা হয়েছে যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।
- ৯৭ শতাংশ সংখ্যালঘুকে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে এবং উচ্চ শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ১৭ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গড়ে তোলা হচ্ছে ৫২৮টি নতুন কর্মতীর্থ।

অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নে পথিকৃৎ বাংলা

অনগ্রসর কল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে আছে আমাদের রাজ্য। এ ক্ষেত্রে আমরা কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

- শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮ লক্ষেরও বেশি তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- বর্তমানে সরকারের আমলে প্রায় ৬৫ লক্ষ তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি/অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।
- কেন্দু পাতা সংগ্রহকারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা চালু করেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দু লিভস কালেক্টরস সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম।
- তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের দেশে পড়াশোনার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ও দেশের বাইরে পড়াশোনার জন্য ২০ লক্ষ টাকার ঋণ প্রদান করা হচ্ছে এবং এই উদ্যোগ আজ দেশের মধ্যে মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।
- সাঁওতালি ভাষাকে ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- আদিবাসী বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের সংখ্যা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রত্যেককে মাসিক ১,০০০টাকা ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ত ও পরিবহণে উন্নয়নের আলোয় উজ্জ্বল বাংলা

পূর্ত ও পরিবহণ ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের সময়ে বাংলা প্রত্যক্ষ করেছে উন্নয়নের জোয়ার। গত সাত বছরে আমরা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছি।

- কলকাতায় মা উড়ালপুল, গার্ডেন রিচ উড়ালপুল, বাগুইআটি উড়ালপুল নির্মিত হওয়াতে যান চলাচলে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভসরাঘাটে জঙ্গলকন্যা সেতু, আমকলাতে লালগড় সেতু এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বোলেরবাজারে মৃদঙ্গ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১২ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। মেছোগ্রাম থেকে মোড়গ্রাম নর্থ সাউথ রোড করিডোর, ভুটান-বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ ও নেপাল-বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়ে ২- এর কাজ চলছে।
- অন্ডালে চালু করা হয়েছে কাজি নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর।

সেচ ক্ষেত্রে প্রগতির পথে বাংলা

আমাদের শুরু করা বিভিন্ন কর্মসূচি সেচ ক্ষেত্রে বাংলাকে দিয়েছে উন্নয়নের নতুন দিশা।

- জলতীর্থ প্রকল্পে জঙ্গলমহল অঞ্চলে চেক ড্যাম, জল সংরক্ষণের কাজ চলছে।
- নিম্ন-দামোদর উপত্যকার হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় ২৭৬৮ কোটি টাকায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন কাজ হয়েছে।
- ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান, কান্দি মাস্টার প্ল্যান, কেলেঘাই কপালেশ্বরী বাগাই খাল সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

পুর ও নগরোন্নয়ন ক্ষেত্রে বাংলার অগ্রগতি

পুর ও নগরোন্নয়নে আমাদের কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

- গঠন করা হয়েছে মুকুটমণিপুর, গঙ্গাসাগর-বকখালি, তারাপীঠ-রামপুরহাট, বক্রেশ্বর এবং পাথরচাপুরী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- শহরাঞ্চলে গরিবদের জন্য বাসস্থান প্রকল্পে প্রায় দেড় লক্ষ দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছেন।
- গ্রীষ্মকালে বাড়তি জলের জোগান দিতে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন পৌরসভাগুলিকে জলবহনের জন্য দু-চাকার স্টিলের ট্যাঙ্কার ও ট্রাক্টর প্রদান।

সড়ক এবং পানীয় জল সরবরাহে এগিয়ে চলেছে বাংলা

এই সরকারের আমলে নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ এবং পুরোনো রাস্তার সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২৩ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে এবং নতুন আরও ১৩ হাজার কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্যের সকল মানুষের কাছে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেও এই সরকার কাজ করে চলেছে নিরলস ভাবে। কলকাতার ধাপায় জয়হিন্দ ও গার্ডেন রিচে জলসাথী জল প্রকল্প চালু হয়েছে। পুরুলিয়ায় ১২০০ কোটি টাকার জেআইসিএ প্রকল্প ও বাঁকুড়ায় ১১০০ কোটি টাকার পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

পর্যটনে এগিয়ে আছে বাংলা

পর্যটনের ক্ষেত্রে বাংলা একটি আকর্ষণীয় অঞ্চল। এই ক্ষেত্রের উন্নয়নে আমরা আজ অনেক এগিয়ে গেছি।

- কলকাতায় ৩ হাজারেরও বেশি আধুনিক সুবিধা যুক্ত হোটেল রুমের ৬৭%-ই পর্যটকে পূর্ণ থাকছে। যে কারণে, ২০১৬ অর্থবর্ষে দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে ছিল বাংলা।
- রাজ্যে হোম-স্টে পরিষেবা বৃদ্ধি পাচ্ছে ৩০ শতাংশ হারে যা প্রায় ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছে।

- চিকিৎসা পর্যটনে এই রাজ্য এগিয়ে চলেছে দুরন্ত গতিতে। আশা করা যায় ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ২৪ লাখ এবং ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় ৫০ লাখ চিকিৎসা পর্যটক আসবেন এই রাজ্যে।
- নিউটাউন 'নজরুল তীর্থ', মাদার্স ওয়াক্স মিউজিয়াম ও কলকাতা গেট নিউটাউনকে দিয়েছে নতুন আকর্ষণ। উত্তরবঙ্গে বেঙ্গল সাফারি ওয়াইল্ডলাইফ পার্ক, মুর্শিদাবাদের মোতিঝিলে 'প্রকৃতি তীর্থ', বীরভূমে 'রাঙা বিতান' এবং বলাগড়ে সবুজদ্বীপ ইকো-টুরিজম প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে।
- জলপাইগুড়ির গাজোলডোবায় 'ভোরের আলো', বোলপুরে খোয়াইয়ের ধারে 'বাউল বিতান', ঝড়খালিতে ইকো-টুরিজম প্রকল্প 'ঝড়' এবং সুন্দরবন বন্যপ্রাণ উদ্যান তৈরি করার কাজ চলছে।
- রেড রোডে আয়োজিত দুর্গা পুজোর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল, পৌষ মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, কেঁদুলির জয়দেব মেলা ইত্যাদি মেলা ও উৎসবে যোগ দিতে দেশ বিদেশের লাখো লাখো লোক প্রতি বছর হাজির হচ্ছেন এই রাজ্যে।

ক্রীড়া উন্নয়নে উদ্যোগী সরকার

ক্রীড়া ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আমরা নতুন ক্রীড়া নীতি প্রণয়ন করেছি। ক্রীড়া সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যের ১৮ হাজারেরও বেশি ক্লাবকে ইতিমধ্যেই আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। ৪৯টি নতুন স্টেডিয়াম, ৩৮১টি মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়াম এবং ২,৩৪৮টি মাল্টিজিম নির্মাণ করা হচ্ছে। বিগত দিনের তারকাদের সম্মানে খেল সম্মান, বাংলার গৌরব সম্মান, ক্রীড়াগুরু সম্মান প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যের সর্বত্র ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা অনুষ্ঠিত করছি জঙ্গমহল কাপ, হিমল-তরাই-ডুয়ার্স কাপ সুন্দরবন কাপ প্রভৃতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

প্রশাসনিক সংস্কারে নতুন দিশা

প্রশাসানিক সংস্কারে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছি।

- প্রশাসনিক কাজে আরও গতি আনতে এবং কাজের অগ্রগতির উপরে নজর রাখতে এই সরকার ২০১৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশ করছে প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার।
- ৪০৫টিরও বেশি উন্নয়ন পর্যালোচনা বৈঠক ও পরিষেবা বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সরকারি বিভাগের সংখ্যা ৬৩ থেকে কমিয়ে ৫১ করা হয়েছে।
- মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ আরও নিবিড় করতে এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে আরও গতি আনতে এই সরকার আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বর্ধমান, এই চারটি নতুন জেলা তৈরি করেছে। এ ছাড়া সুন্দরবন ও বসিরহাট অঞ্চলকে নিয়ে নতুন জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
- আলিপুরদুয়ারে প্রথম সুসংহত প্রশাসনিক পরিসর 'ডুয়ার্স কন্যা' নির্মাণ করা হয়েছে।
- মালদা এবং মেদিনীপুর, এই দুই নতুন বিভাগ তৈরি করা হয়েছে।
- প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে মিরিক (দার্জিলিং), ঝালদা এবং মানবাজার (পুরুলিয়া), এই তিনটি নতুন মহকুমা তৈরি করা হয়েছে।

আইন শৃঙ্খলাতে বাংলার অগ্রগতি

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আমরা বেশি কিছু নতুন পদক্ষেপ করেছি।

- শিলিগুড়ি, ব্যারাকপুর, বিধাননগর, আসানসোল-দুর্গাপুর, হাওড়া ও চন্দননগর এই ৬টি নতুন পুলিশ কমিশনারেট স্থাপন।
- আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, সুন্দরবন, ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর ও বসিরহাট এই ৮টি নতুন পুলিশ জেলা তৈরি করা।
- উপকূলবর্তী থানা ও সাইবার থানা -সহ ১০৮টি নতুন থানা স্থাপন।
- ৭৩টি মহিলা থানার মধ্যে ৪৮টি ইতিমধ্যেই স্থাপিত। ২০১১ সালের আগে এরাজ্যে কোনও মহিলা থানা ছিল না।

আমাদের সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি মানুষের জন্ম থেকে অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করেছে

সবুজশ্রী

সদ্যোজাত শিশুদের ভবিষ্যতের পড়াশোনা এবং অন্যান্য খরচ নির্বাহের লক্ষ্যে সবুজশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে নবজাতককে ব্যবসায়িক অর্থমূল্য যুক্ত গাছের চারা প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ লক্ষেরও বেশি চারা গাছ বিতরণ করা হয়েছে।

কন্যাশ্রী

নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে এবং বাল্য বিবাহ রোধে এই সরকারের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল কন্যাশ্রী প্রকল্প। এই প্রকল্পে ছাত্রীদের ১৮ বছর পর্যন্ত বার্ষিক ভাতা ও ১৮ বছর উত্তীর্ণ করলে এককালীন অনুদান দেওয়া হয়। এছাড়া, উচ্চ শিক্ষার জন্যও ক্ষেত্র বিশেষে মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। আমাদের রাজ্যের স্বপ্নের এই প্রকল্প অর্জন করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। প্রায় ৫০ লক্ষ মেয়ে আজ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

সবুজ সাথী

স্কুলছুটের সংখ্যা কমাতে এবং ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সবুজ সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে নবম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের নতুন সাইকেল প্রদান করছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে ইতিমধ্যেই ৭০ লক্ষ সাইকেল বিতরণ করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে।

শিক্ষাশ্রী

তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বই কেনা ও পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য শিক্ষাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ৪০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আজ এই প্রকল্পের সুবিধাভোগী।

যুবশ্রী

রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের আর্থিক সহায়তা এবং চাকরি সংক্রান্ত সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শুরু করেছে যুবশ্রী প্রকল্প। ২ লক্ষেরও বেশি যুবকযুবতী এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন।

রূপশ্রী

রূপশ্রী প্রকল্পে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারের ১৮ বছর উত্তীর্ণ মেয়েদের বিয়ের সময় সাহায্যের জন্য এককালীন ২৫০০০ টাকা সাহায্য প্রদান শুরু হয়েছে ১লা এপ্রিল, ২০১৮ থেকে। প্রতি বছর রাজ্যের প্রায় ৬ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন।

খাদ্যসাথী

রাজ্যের মানুষকে খাদ্য সুরক্ষা দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালু করেছে খাদ্যসাথী প্রকল্প। এই প্রকল্পে প্রতি মাসে ২ টাকা কেজি অথবা বাজারদরের অর্ধেক দামে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। রাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ আজ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গ্রামীণ আবাস

গ্রামীণ আবাস প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণিকে বাড়ি তৈরির জন্য সাহায্য করে সরকার। ৩০ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, অঙ্গনওয়াড়ী, শিক্ষক, প্যারা-টিচার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মী এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মী, কেবল অপারেটরগণদের জন্য সরকার চালু করেছে স্বাস্থ্যসাথী নামে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্প। রাজ্যের ৫৬ লক্ষ লোক আজ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

গতিধারা

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া যুবকযুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত গাড়ি কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ভরতুকি দেওয়া হয় গতিধারা প্রকল্পে। ২৮ হাজারেরও বেশি লোক এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছেন।

সমব্যথী

অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের কারও মৃত্যু পরবর্তী সৎকারে নিকটাত্মীয়কে এককালীন আর্থিক সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সরকার শুরু করেছে সমব্যথী প্রকল্প।

সাবধানে চালও জীবন বাঁচাও

রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা রুখতে রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ ও পরিবহন দপ্তরের যৌথ প্রয়াসে আমরা চালু করেছি 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি। এর ফলে পথ দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে।

সময়	দুর্ঘটনার সংখ্যা	হতাহতের সংখ্যা
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৬ (সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি শুরুর আগে)	৩,৪৪৯	১,৭০৩
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৭	৩,১৭৭	১,৫৯৪
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৮	২,৭১৮	১,৪০৯

এছাড়া লোকশিল্পী, সিনেমা-টেলিভিশন শিল্পী ও সাংবাদিকদের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে এই সরকার। তাঁদের জন্য এই সরকার শুরু করেছে বিভিন্ন প্রকল্প।

রাজ্যের লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, লোকশিল্পীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই সরকার লোকপ্রসার প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পীদের প্রতি মাসে পেনশন এবং বহাল ভাতা দিচ্ছে। এ ছাড়াও প্রতি অনুষ্ঠান বাবদ শিল্পীরা পাচ্ছেন সম্মান দক্ষিণা। এই প্রকল্প থেকে ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছেন প্রায় ২ লক্ষ লোকশিল্পী।

রাজ্যের সিনে এবং টেলিভিশন শিল্পে কর্মরত শিল্পী, কলাকুশলী ও তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসা ও দুর্ঘটনা বিমা চালু করেছে এই সরকার। এর ফলে ইতিমধ্যেই উপকৃত হয়েছে ২৫ হাজার শিল্পী ও তাঁদের পরিবার।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অ্যাক্রিডেটেড সাংবাদিক ও তাঁদের নির্ভরশীল পারিবারিক সদস্যদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধাদানের জন্য এই সরকার চালু করেছে 'মাভৈ-ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম ফর জার্নালিস্টস, ২০১৬'। প্রায় ৭৫০ জন সাংবাদিক ও তাদের পরিবার-সহ প্রায় ১৯৫০ জন আজ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

এ ছাড়া তথ্য ও সংস্কৃতিতে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে এই সরকার। গঠন করা হয়েছে সাঁওতালি ভাষা আকাদেমি, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি ও জয়দেব-কেন্দুলি বাউল আকাদেমি। কুরুক, কুরমি, রাজংবশী ও কামতাপুরীকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

শিল্প-সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল বাংলা

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা রাজ্য। সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ২৩তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বের সিনেমা এসে হাজির হয়েছে বাংলার আঙিনাতে। বাংলা সঙ্গীত মেলা থেকে শুরু করে

বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব, এই রাজ্যকে মুখরিত করেছে গানে, সুরে। টেলিভিশন জগতে কৃতী শিল্পীদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসাবে প্রদান করা হয়েছে টেলিসম্মান এবং সেখানে সম্মান জানানো হয়েছে বিশিষ্ট টিভি ব্যক্তিত্বদেরও। শারদোৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিমা নিরঞ্জনের এক বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের সেরা দুর্গা প্রতিমাগুলিকে নিয়ে কলকাতার রেড রোডে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় এই শোভাযাত্রা। প্রতি বছর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিবেক চেতনা উৎসব, সুভাষ উৎসব, বাউল উৎসব, যাত্রা উৎসব।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বিনোদন, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সরকার দেখিয়ে চলেছে সার্বিক উন্নয়নের নতুন নতুন দিশা। সব ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে সম্প্রীতিতে এই রাজ্য স্থাপন করেছে নতুন দৃষ্টান্ত। রাজ্যের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে এবং বাংলাকে ফের শ্রেষ্ঠ আসনে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গত ৭ বছর ধরে আমরা কাজ করে চলেছি নিরলস ভাবে। আমাদের উপরে থাকা আপনাদের সকলের আস্থা এবং বিশ্বাসের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

এই সরকারের সফল সাত বছর পূর্তিতে আমরা শপথ নিচ্ছি যে, মানুষের সেবা এবং বাংলার সার্বিক উন্নতির পথে আমরা এগিয়ে যাব দৃপ্ত পদক্ষেপে। আপনাদের সমর্থন, শুভেচ্ছা ও 'দোয়া' থাকলে, আমাদের নবপ্রজন্ম, বর্তমান ও ভবিষ্যতের স্বার্থে, বিশ্ব বাংলাকে বিশ্বসেরা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের স্বপ্ন ও লক্ষ্য।

আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় হিন্দ

জয়তু বাংলা

আপনাদের
মমতা

বঙ্গদর্শন

বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ধারা আবহমান কাল ধরে বহন করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। ছবি ও প্রবন্ধে তারই কিছু তথ্য তুলে ধরা হল। কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষকের রচনা প্রকাশিত হল এই বিভাগে। ছবিগুলি প্রাবন্ধিক সূত্রে প্রাপ্ত।

উত্তম-সন্ধ্যায় আবেগঘন মুখ্যমন্ত্রী

বিশ্ববাংলা যতদিন থাকবে, বাঙালির মননে-চিন্তনে-স্বপনে-দর্শনে-প্রাণে পল্লবিত হয়ে থাকবেন উত্তমকুমার। তিনি এখনও 'দ্য টপ'। বাংলায় প্রতিভার জুড়ি মেলা ভার। অগ্নিপরীক্ষায় আজও সবার ওপরে চিরদিনের নায়ক উত্তমকুমার। আর বিশ্ববাংলা একদিন বলিউডকেও জয় করে এগিয়ে যাবে। ২৪ জুলাই সন্ধ্যায় নজরুলমঞ্চে সন্ধ্যায় এভাবেই উত্তমকুমারে কীভাবে বাংলা ও বাঙালির মনন ঋদ্ধ হয়ে রয়েছে, তা তুলে ধরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। পুরস্কৃত হলেন বিশিষ্টরা, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপর্ণা সেন ও পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি: সঞ্জয় সমাদ্দার ⇨

সম্মানীত যাঁরা

মহানায়ক সম্মান :	অপর্ণা সেন ও পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বসেরা চলচ্চিত্র সম্মান :	শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস, শ্রীকান্ত মেহতা
সেরা চিত্রনাট্যকার :	কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়
সেরা অভিনেতা :	আবির চট্টোপাধ্যায়
সেরা অভিনেত্রী :	মিমি চক্রবর্তী
সেরা সঙ্গীত পরিচালক :	জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
সেরা পরিচালক :	মানসমুকুল পাল
সেরা শিশু অভিনেতা :	নূর ইসলাম ও সামিউল আলম
সেরা চিত্রগ্রাহক :	শীর্ষ রায়

অপর্ণা সেন সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওঁর লিপে গানগুলো সুন্দর। উনি অভিনেত্রী। পরিচালক। সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় অবদান রয়েছে। সত্যজিৎ রায়-ও তাঁর অভিনয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন। আর অপর্ণা সেন বলেন, উত্তমবাবুর অভাবে অনেক না-বলা গল্প রয়ে গেল। উনি থাকলে আরও অভিনয় পেতাম। পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে মানুষ এখনও জীবিত, তাঁর তিরোধান দিবস পালন করে কী লাভ !

ছিলেন গৌতম ঘোষ, মাধবী মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, রঞ্জিত মল্লিক, প্রসেনজিৎ, ইন্দ্রাণী হালদার, অরিন্দম শীল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, তথ্য-সংস্কৃতি সচিব বিবেক কুমার উত্তমকুমারের ছবির গান গেয়ে শোনান।

ক্যামেরাবন্দি অনুষ্ঠানের কয়েকটি মুহূর্ত

এই প্রতিবেদনের ছবি: অশোক মজুমদার

গুরুসদয় দত্ত ও তাঁর ব্রতচারী আন্দোলন

ড. মনোজিৎ অধিকারী

২০১৭-র আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বের বিখ্যাত চলচ্চিত্রের মাঝে স্থান পেয়েছিল একটি তথ্যচিত্র। বিষয়—গুরুসদয় দত্ত। বাংলায় ব্রতচারী আন্দোলন ও গুরুসদয় দত্ত সমার্থক। তথ্যচিত্র নির্মাতা ড. মনোজিৎ অধিকারীর কলমে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল।

চল কোদাল চালাই—ভুলে মানের বালাই
ঝেড়ে অলস মেজাজ—হবে শরীর ঝালাই
যত ব্যাধির বালাই—বলবে পালাই পালাই
পেটে খিদের জ্বালায়—খাব ক্ষীর আর মালাই।

এই গান এই শব্দবন্ধন-এর সঙ্গে যে নামটি স্বাভাবিক নিয়মে ধ্বনিত হয়, তা হল 'ব্রতচারী'। 'ব্রত' পালনে সুনির্দিষ্ট আচরণ যে করে, সে-ই 'ব্রতচারী'।

কী সেই ব্রত?

কে সেই ব্রতের প্রাণপুরুষ।

উত্তর একটাই।

গুরুসদয় দত্ত।

আগ্রহ বাড়তে থাকায় ব্রতচারী শিক্ষা গ্রহণ করলাম ১৯৮০ সালে। সেই থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়লাম ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে। এরপর বেশ কয়েকটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিছু কিছু তথ্যচিত্র বানাচ্ছি।

২০০০ সালে মনে হল ব্রতচারী নিয়ে কিছু একটা করা দরকার। যেমন ভাবনা, তেমন কাজ শুরু করলাম। বলতে পারি, সলতে পাকানো শুরু হয়। কিন্তু নানা বাধা আসতে লাগল। বলা বাহুল্য, আমি একজন ব্রতচারী নায়ক ও বাংলার ব্রতচারী সমিতির সংসদ সদস্য। এসব সত্ত্বেও আমার বাধা কিন্তু দূর তো হল না, বরং বাড়তে লাগল। অনেকের মনে হল এই কাজটা করে আমি প্রচুর টাকা উপার্জন করব। তাই তাঁরা আমার এই কাজের জন্য বেশ কিছু টাকা নিয়েছেন শ্যুটিং করার জন্য বা ব্রতচারী গ্রামকে ব্যবহার করার জন্য। তা ঘরেই যখন এই অবস্থা তাহলে আমাকে কে আর এই কাজের জন্য আর্থিক সহায়তা করবে? যাই হোক, অবশেষে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর সহযোগিতায় কাজে নামলাম। কিন্তু তাতেও কিছু মানুষের অসহযোগিতা থেকেই গেল। তাঁরা কিছুতেই চান না যে কাজটা হোক। অবশেষে বহু কষ্টে 'ব্রতচারী' নামে তথ্যচিত্র শেষ করলাম ২০১৩ সালে। ছবিটা করার সময় ঠিক করেছিলাম সব ব্রতচারী গান ও নাচগুলোকে রাখব। সেইমতো কাজ চলছিল। কিন্তু বাধ সাধল সময়। দেখা গেল প্রায় ৭ ঘণ্টার ছবি। এত বড়ো ছবি দুই খণ্ডে করলেও দর্শক নেবে কিনা সন্দেহ। তাই সব ব্রতচারী নাচগুলোকে বাদ দিলাম। দেখা গেল সেটিও প্রায় ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। আর সব গান অর্থাৎ প্রায় আশিটা গান বাদ দিলাম। ঠিক করলাম এগুলোকে আলাদা আলাদা ক্যাসেট করব। ফলে সকল ব্রতচারী গানগুলোকে নিয়ে 'ব্রতচারী গীতালি' ও সকল ব্রতচারী নাচগুলো এবং আরও কিছু লোকনৃত্য নিয়ে তৈরি করলাম 'ব্রতচারী নৃত্যালি' নামে দুটি সিডি। এইভাবে সব কিছু বাদ দিয়ে ছবির দৈর্ঘ্য দাঁড়াল ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। এই ছবির প্রিমিয়ার করলাম ২৫ জুন, ২০১৩ নন্দন-৩ প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটি দেখার পর সকলে অভিভূত। যাঁরা এতদিন প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। কিন্তু তার পরেও বিরোধিতা বজায় থাকল। তাঁদের অভিমত, আমি এ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছি। সত্যি কথা বলতে কি, এই ছবিটা করতে গিয়ে আমার প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। আর এই টাকার কিছুটা এসেছে আমার প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে, আর কিছুটা একজন শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে ধার করে, যার জের এখনও চলছে প্রতি মাসে সুদ দিয়ে। জানিনা কবে এই ঋণ থেকে মুক্ত হব। এ জন্যে আমার দুঃখ নেই, কারণ কাজটা আমি আমার ভালোবাসা এবং একজন ব্রতচারী হিসাবে কিছু করার তাগিদ থেকেই করেছি।

এই কাজটা করার জন্য আমি যাঁদের সহযোগিতা পাই তাঁরা হলেন নরেশজি (নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়), চন্দ্রাজি (চন্দ্রা মিত্র শী), কমলেশজী (কমলেশ চ্যাটার্জ্জি), বিজনজি (ড. বিজন কুমার মণ্ডল), শঙ্কর প্রসাদ দেঁড়ে (শঙ্করজি), খালেদ চৌধুরী,

দেবসদয় দত্ত, হাবিব চৌধুরী (শেষোক্ত দু-জনেই গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের নাতি) ও মাফিজা খাতুন-এর মতো মানুষদের কাছ থেকে। যাঁরা আমাকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে গিয়েছেন বা আজও করে যাচ্ছেন। হাবিবজি বিস্তারিত তথ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেন, কিভাবে তাঁরা এই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হলেন। তিনি জানালেন, তৎকালীন দিনে অনেকেই দিল্লির দরবারে চাকরী করতেন, তাদের মধ্যে সর্ব্বানন্দ দত্তচৌধুরী ছিলেন দিল্লীর সুলতান বহলুল লোদীর যুদ্ধমন্ত্রী। তিনি বহলুল লোদীর দুই পুত্র অর্থাৎ দুই শাহজাদার মধ্যে দাবাখেলার সময় ছোটো শাহজাদার পক্ষে দাবার চাল বলে দেওয়ায় বড়ো শাহজাদা হেরে যায় এবং সে সর্ব্বানন্দ দত্তচৌধুরীর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। অপরদিকে ছোটো শাহজাদা সর্ব্বানন্দ দত্তচৌধুরীর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে। ফলে পারিবারিক কলহ সৃষ্টি হয়। এমন সময় বহলুল লোদী এই পারিপারিক কলহের মীমাংসা স্বরূপ সর্ব্বানন্দ দত্তচৌধুরীকে অন্য একটা ধর্ম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। তখন সর্ব্বানন্দ দত্তচৌধুরী মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন। অর্থাৎ হিন্দু হিসাবে তাঁর মৃত্যু হল বটে কিন্তু মুসলমান হিসাবে তাঁর পুর্নজন্ম হল এবং তাঁর তখন থেকে নাম হল সরওয়ার খান। এই সরওয়ার খান-এর বংশধররা হলেন হাবিব দত্তচৌধুরী, যাঁরা বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় বসবাস করেন। অর্থাৎ গুরুসদয় দত্ত-র মুসলমান শাখার একজন নাতি হলেন হাবিব দত্তচৌধুরী, যিনি বাংলাদেশের ব্রতচারীর সঙ্গে যুক্ত।

তথ্যচিত্র 'ব্রতচারী', 'ব্রতচারী গীতালি' ও 'ব্রতচারী নৃত্যালি' দেখে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান মাননীয় অভীক মজুমদার এক প্রশংসা পত্র দেন। পত্রটি সংযোজিত করলাম।*

কাজটা করবার জন্য আমি পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যেমন ঘুরেছি, তেমনি বিহারের আরা জেলায়, বাংলাদেশের সিলেটসহ ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, বগুড়া, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলাতেও ঘুরেছি। বাংলাদেশে একাই গিয়েছি, পরে অবশ্য নরেশজি গিয়েছিলেন। উনি আমাকে সিলেটে ও সনজিদা খাতুনের কাছে নিয়ে যান। গুরুজির জন্মভূমি, বিদ্যালয়, হাবিবজি-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ও পাশে থেকে গাইড করেছেন। শঙ্করাজি, নরেশজি ও অন্যান্য ব্যক্তিরা আমার পাশে না থাকলে আর গুরুজির আশীর্বাদ না থাকলে আমি এই কাজ করতেই পারতাম না, তাই এঁদের সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

২০১৭ সালে দর্শকদের ও ব্রতচারীদের অনুরোধে 'গুরুসদয় দত্ত' নামে ৩৮ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করি। এবার সেই ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

শ্রীহট্ট জেলার কুশিয়ারী নদীর তীরে অবস্থিত বীরশ্রী গ্রামে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মে দত্ত চৌধুরী পরিবারে গুরুসদয় জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি পিতা-মাতাকে হারান। ব্রিটিশ রাজত্বকালে একজন শীর্ষস্থানীয়

প্রশাসক হয়েও তিনি এদেশে বিদেশি শাসকের স্বার্থে নিজেকে ঢেলে দেননি বরং বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর দুঃখ ও দুর্দশা মোচনে তিনি সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পরম নিষ্ঠায়, গড়ে তুলেছিলেন ব্রতচারী আন্দোলন। উল্লেখ করা যেতে পারে গুরুসদয় দত্ত-র জন্মভিটাতেই তৈরি হয়েছে 'গুরুসদয় উচ্চ বিদ্যালয়', ১৯৮২ সালে।

শ্রীহট্ট গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে তিনি ১৮৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯০১ সালে এফ-এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০২ সালে বিলাত যান শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সহায়তায়, সেখানে কেমব্রিজের ইমানুয়েল কলেজে পড়াশুনা করেন। বিলাতে আই সি এস ও ব্যারিস্টারি পড়েন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ১৯০৫ সালে। এরপর তিনি দেশে ফিরে আসেন ও বিহারের আরা জেলায় মহকুমা শাসকের পদে নিযুক্ত হন।

১৯০৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আই সি এস ব্রজেন্দ্রনাথ দে-র চতুর্থ কন্যা সরোজনলিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০৯ সালে একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্রসদয় দত্তের জন্ম হয়। গুরুসদয় দত্ত অদম্য সাহসী শিকারী ছিলেন। কখনো পূর্ণিয়ার জঙ্গলে, কখনো সুন্দরবনে শিকারে যেতেন। একবার একটি বাঘও শিকার করেন। পরে অবশ্য সরোজনলিনীর অনুরোধে শিকার করা ছেড়ে দেন।

১৯১১ সালে বাংলা ভাগ হয়ে বিহার তৈরি হলে গুরুসদয় বিচার বিভাগে কাজ নিয়ে বিহার থেকে বাংলায় চলে আসেন।

১৯১২ থেকে ১৯১৫। এই সময় তিনি অবিভক্ত বাংলার খুলনা, বগুড়া, যশোহর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় বিচার বিভাগে কাজ করেন। ইংরেজ সরকার বুঝতে পারে আই সি এস হলেও গুরুসদয় দত্ত তাঁদের তাঁবেদার নন। একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমী। আর সেই কারণেই তাঁকে বারবার বদলি করা হয় বাংলার বিভিন্ন জেলাতে। তবে তিনি যেখানেই যেতেন সেখানকার উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিতেন। পরাধীন দেশে তিনি মনে করতেন অচিরেই স্বাধীনতা আসবে। আর সেই স্বাধীনতা রক্ষা করবে দেশের আদর্শবান যুবসমাজ। তাই তিনি নানা সময়ে নানা কাজের মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে, নাচের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করতেন যুবসমাজের মধ্যে।

১৯১৭ সালে বীরভূম জেলার কালেক্টর হন। এই সময় তিনি নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেন। গঠন করেন লিজ ক্লাব অ্যামেচার মিউজিক্যাল সোসাইটি। ১৯২০ সালে ১৭ এপ্রিল স্ত্রী-পুত্র-সহ জাপান ভ্রমণ করেন। সেখানকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পর্যবেক্ষণ করে তিনি বুঝেছিলেন, দেশকে উন্নত করতে হলে নারী জাগরণই হবে প্রথম ও প্রধান কাজ।

১৯২১ সালে বাঁকুড়া জেলার জেলাশাসক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি সমবায় প্রথায় চাষের কাজের প্রকল্প শুরু করেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাঁকুড়া জেলায় এক স্বদেশী কৃষি ও শিল্পমেলার প্রচলন করেন গুরুসদয় দত্ত। এই মেলার মধ্যে দিয়ে তিনি চাষি-মজুর, ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

১৯২৩ সালে শাসন বিভাগ থেকে বদলি হয়ে কৃষি ও শিল্প বিভাগের সচিবের কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি সরোজনলিনী দেহত্যাগ করেন। সরোজনলিনীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং দুস্থ মহিলাদের কল্যাণে ২৩ ফেব্রুয়ারি সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রাম-গ্রামান্তরে স্থাপন করেন বহু নারী মঙ্গল সমিতি। পরাধীন ভারতে নারী যাতে তাঁর নিজস্ব কর্ম ও মুক্তির জগৎ খুঁজে নিতে পারে সেই অভিপ্সাতেই সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বা মঙ্গলই ছিল এর উদ্দেশ্য। তাঁর কথায়—

'শিশু দোলে যাদের কোলে
তাদের জোরেই রাজ্য চলে
অন্ধকারে থাকলে মা'রা
মানুষ গঠন করবে কারা?
নারী যদি না পায় মুক্তি
স্বরাজ রক্ষার বৃথাই যুক্তি।'

যোগাযোগ রক্ষাকারী মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্রকাশ করেন এই সময়ে।

১৯২৬ সালে হাওড়ার জেলাশাসক হয়ে তিনি আবার শাসন বিভাগে ফিরে আসেন। এই সময় গ্রাম উন্নয়নের জন্য গ্রামের ডাক পত্রিকার প্রচলন করেন ও হাওড়া জেলা কৃষি ও হিতকারী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য পুকুর, খাল কাটান, জঙ্গল, পানা নির্বাসনের জন্য সকলকে উৎসাহিত করলেন। রচনা করলেন গ্রামের গীত। তিনি জানতেন গ্রামের মুক্তি ঘটলেই স্বদেশের মুক্তি ঘটবে।

১৯২৮ সালের ১০ মার্চ মাহিনা বাড়ানোর দাবিতে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রেলওয়ের লিলুয়া ওয়ার্কশপের শ্রমিকরা বেঙ্গল ইউনিয়ন ফেডারেশন-এর নেতৃত্বে ধর্মঘট শুরু করেন। ২৮ মার্চ বুধবার তাঁরা বামনগাছি লকো কারখানার গেটে উপস্থিত হন ও কর্মরত শ্রমিকদের ধর্মঘটে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। তখন প্রহরারত ইংরেজ মিলিটারি ও পুলিশ জেলা শাসকের বিনা অনুমতিতে তাঁদের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। এর ফলে ঘটনাস্থলেই ৪ জন নিহত ও ৩৫ জন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যেই জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তদন্তকার্য আরম্ভ করেন। বিচারক গুরুসদয় দত্ত তাঁর রায়ে পুলিশ সুপার MR. STURGIS ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার্স বাহিনীর অধিনায়ক CAPTAIN CHRISTIE-কে দোষী সাব্যস্ত করেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী এই ঐতিহাসিক রায়দান ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য দলিল হয়ে আছে। এর পর

তাঁকে হাওড়া জেলা থেকে বদলি করা হয় অবিভক্ত বাংলার মৈমনসিংহ জেলায়। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন মৈমনসিংহ লোকনৃত্য ও লোকগীতি সমিতি। সাম্প্রদায়িক বিভেদ রোধ করার জন্য তিনি বাউল ও জারি নৃত্যকে ব্যবহার করলেন। সমগ্র বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হল সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও স্বদেশপ্রেমের গান। কবিতা, গান, ছোটোদের জন্য ছড়া লেখা ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি সামাজিক পরিস্থিতির প্রতি ব্যঙ্গাত্মক ও কটাক্ষমূলক ছড়া লেখেন। বঙ্গলক্ষ্মী পত্রিকায় 'গড়ের মাঠ' নাম দিয়ে ছোটো ছোটো অনেক ছড়া তিনি রচনা করেছেন। ছড়ার মধ্য দিয়ে সে দিনের দেশ, কাল, সমাজের কথা ফুটে ওঠে। গুরুসদয় দত্ত বেশ কিছু গ্রন্থ লিখেছিলেন। এগুলোর অধিকাংশই আজ দুস্প্রাপ্য। উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ— ভজার বাঁশি (ছড়া), গোড়ায় গলদ, গ্রামের কাজের ক খ গ। সরোজনলিনী, পল্লী সংস্কার ও সংগঠন, পাগলামির পুঁথি (ছড়া), পুরীর মাহাত্ম্যও, গানের সাজি, বাংলার সামরিক ক্রীড়া, পটুয়া, চিত্রলেখ, চাঁদের বুড়ি (ছড়া), ব্রতচারী সখা, ব্রতচারী মর্মকথা, পটুয়াসঙ্গীত, ব্রতচারী পরিচয়, শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত (সম্পাদিত), বাংলার বীরযোদ্ধা রায়বেঁশে, AGRICULTURAL ORGANISATION AND RURAL RECONSTRUCTION IN BENGAL, A WOMAN OF INDIA, FOLK SONG AND FOLK DANCE IN INDIAN SCHOOL, CATELOGUE : EXHIBITION OF BENGAL FOLK ART, THE INDIAN FOLK DANCE AND FOLK SONG MOVEMENT, BRATACHARI SYNTHESIS, BRATACHARI ITS AIM AND MEANING, FOLK DANCES OF BENGAL, FOLK ARTS AND CRAFTS OF BENGAL, ART OF KANTHA (ALBUM). এছাড়া তিনি চারটে পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। যেমন-মাসিক বঙ্গলক্ষ্মী (১৯২৬), দ্বিমাসিক গ্রামের ডাক (১৯২৯), মাসিক ব্রতচারী বার্তা (১৯৩৪) এবং মাসিক বাংলার শক্তি (১৯৩৬)। এই 'বাংলার শক্তি' আজও নিয়মিত প্রকাশ হয়।

অনেকেই হয়ত জানেন না, বাংলার প্রথম লিমেরিক ছড়ার প্রবর্তক ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। এডোয়ার্ড লীয়র এর মূল প্রবর্তক। লিমেরিককে বলা হয় এক ধরনের কৃত্রিম ছড়া যার মধ্যে লোকসাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন-'হাম্‌টি-ডাম্‌টি'।

হাম্‌টি-ডাম্‌টি দেয়াল থেকে ধপাস্ করে পড়ে
যত রাজ্যের মিস্ত্রী বলে 'জোড়া দেব কেমন করে?'
কি বলতো? উত্তর- হাঁসের ডিম।

নারী পুরুষের সমানাধিকার আজ আর নতুন কথা নয়। ১৯২৯ সালে গুরুসদয় দত্ত বাংলার পল্লিতে নারীজাতির চরম দুর্দশা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতিদের অন্যায়ের প্রতিবাদে স্বরাজ-লাভের আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে প্রশ্ন তুলে ধরেছিলেন এবং নারীর মুক্তি গানে বলেছিলেন—মায়ের জাতের মুক্তি দে রে—নয়তো যাত্রাপথের বিজয় রথের চক্র তোদের ঠেলবে কে রে?.....

প্রকৃত শিক্ষাই পারে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করতে, তাই সবার আগে চাই সাক্ষরতা। শোষিত

সম্প্রদায়কে চিনিয়ে দিতে হবে শোষক সম্প্রদায়ের প্রকৃতিকে। তার জন্য জ্ঞান আহরণ প্রয়োজন। বিংশ শতকের তিরিশের দশকে গুরুসদয় নিরক্ষরকে সাক্ষর করার আহ্বান জানান লেখাপড়া গানের মধ্যে দিয়ে।

মোরা শিখব লেখাপড়া—
যে লেখাপড়া শিখে না
তার গলায় পড়ে দড়া.....।

সভা-সমিতি কিংবা শিবিরে, জমায়েতে ব্রতচারীরা যাতে নিয়মশৃঙ্খলা পালন করেন তার জন্য তৈরি করেন—

ব্রতচারীর বাক সংযম— একে যবে কথা কয়
অন্য সবে মৌন রয়।
ব্রতচারীর কণ্ঠ সংযম— যত মৃদু হলে হয়
তার চেয়ে উঁচু নয়।
সভার শিষ্টাচার— যেথা কোন সভা হয়
সেথা সবে মৌন রয়।
সভার মৌনতা অভ্যাস—কাকে করে কা- কা-
মানুষ মৌন হয়ে যা।

বেকারত্বকে মনে রেখে হীনম্মন্যতায় ভোগা উচিত নয়। এর ফলে তরুণ সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বেড়ে যাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। তাই গুরুসদয় দত্ত বেকার তরুণদের উদ্দেশ্যে বললেন—

ব্রতচারীর বেকারী বর্জন : হাতের কাছে যে কাজ আসে ব্রতচারী করে
বেকার হয়ে থাকতে বসে সরমেতে মরে।
ব্রতচারীর আত্মবিশ্বাস : অসম্ভব কিছু নয়
সাধনাতে সব হয়।
ব্রতচারীর আদি-নীতি : মন দুরুস্তে তন্ দুরুস্ত
তন্ দুরুস্তে মন দুরুস্ত
ব্রতচারীর অন্তঃশুদ্ধি : নিজে খেটে নাশে দোষ, অপরেরে দোষে না
কারো প্রতি বিদ্বেষ ব্রতচারী পোষে না।

শরীর মন সুস্থ রাখতে খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সেই খাদ্যের পরিমাণ কতটা হবে? এই খাদ্যের পরিমাণ নির্দেশ গুরুসদয় করেছেন এইভাবে—

খাওয়া ও বাঁচা— খাওয়ার জন্য বাঁচি না মোরা বাঁচার জন্য খাই
সে জন অতীব মূর্খ যে করে বেশী খাওয়ার বড়াই
আরো খাও বলে খেতে সাধাসাধি করে যে
প্রিয়জন-পরমায়ু পরিণামে হরে সে।

অর্থাৎ নিজেও যেমন ভোজনবিলাসী হব না, অন্যকেও মাত্রাতিরিক্ত ভোজনে উৎসাহিত করব না।

উচ্ছিষ্ট নিয়ম—উচ্ছিষ্ট ভুঁয়েতে নয়
পাত্রে ফেলিতে হয়।

ব্রতচারী স্বাস্থ্যনীতির নিয়মকানুনকে কঠোরভাবে মেনে চলে। যেমন-

দাঁত মাজা— ব্রতচারী মাজে দাঁত
উঠে ভোরে, পুনঃ রাত
দুবেলা না মাজলে দাঁত
করবে পরে অশ্রুপাত।

হবে জয় নিশ্চয়— মনে ভয় কর লয়—
হবে জয়।—নিশ্চয়

ব্রতচারীর পঞ্চ বর্জন— রাগ ভয় ঈর্ষা লজ্জা ঘৃণা
পাঁচ দোষ ব্রতচারী বিনা।

ব্রতচারীর কর্মাগ্রহ— ব্রতচারী করে কাজ
বিনা ঘৃণা বিনা লাজ।

ব্রতচারীর কার্য— কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য
দমন-সাধনা ব্রতচারিতার কার্য।

ব্রতচারীর নির্লিপ্ত— ফল-নিন্দা-সুখ্যাতি-বিরাগী
ব্রতচারী কৃত্য-অনুরাগী।

তরুণদের আহ্বান জানালেন বাংলার সংস্কৃতি ধারার স্বরূপকে অন্তরে গ্রহণ করার জন্য। তরুণ দল গানে তিনি উদ্দীপিত করলেন তরুণ সমাজকে। তরুণদের কথা তুলে ধরলেন গুরুসদয় তাঁর রচিত তরুণ দল গানের মাধ্যমে—

বাংলা মা'র দুর্নিবার আমরা তরুণ দল
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সঙ্কটে অটল...

প্রত্যেক জাতি তার জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবান, ভূমি-প্রেম ব্রতচারীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। যে ভূমিতে সে জন্মগ্রহণ করে এবং যে দেশের সংস্কৃতি তার মানসিক গঠনের সহায়ক সে ভূমি তার মাতৃসদৃশ। বাংলাভূমির দান গানে গুরুসদয় লিখলেন—

আমরা বাঙ্গালী, সবাই বাংলা মা'র সন্তান
বাংলাভূমির জল ও হাওয়ায় তৈরী মোদের প্রাণ...

আমাদের মাতৃসদৃশ জন্মভূমিকে সুন্দর স্বাস্থ্যকর করে তোলা কেবলমাত্র আমাদের কর্তব্য নয়— আমাদের ধর্ম। তাই তিনি বাংলা ভূমির মাটি গানে লিখলেন—

মোদের বাংলা ভূমির মাটি—তোমার শহর গ্রাম ও বাটি
সযতনে সবাই মোরা রাখব পরিপাটি...

ব্রতচারীর ধর্ম স্ব-ভূমির সেবা ও স্ব-জাতির সেবা। একাধারে এর জন্য যেমন শ্রম করতে হবে অন্যধারে আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে হবে। জ্ঞানরূপ প্রদীপের আলোয় সত্য, ঐক্য ও আনন্দকে খুঁজে নিতে হবে। আমরা বাঙালী গানে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আমরা বাঙ্গালী—আমরা বাঙ্গালী
সত্যে ঐক্যে আনন্দে জীবন-প্রদীপ জ্বালি...

গুরুসদয় দত্ত বিশ্বাস করতেন বাংলার মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টায় বিশ্বে বাংলা তথা ভারত আবার পূর্বের গৌরব

ফিরে পাবে। তিনি তাই সমস্ত ব্রতচারীদের দেশের গৌরব আর মর্যাদা বৃদ্ধি করার ব্রত গ্রহণ করতে বললেন—বাংলার সন্ততি দল গানের মধ্য দিয়ে।

আমরা বাংলার সন্ততি দল—
আমরা শ্রম-ব্রতে সতত সচল...

গুরুসদয় দত্ত বীরভূমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন রায়বেঁশে নৃত্য পুনরাবিষ্কার করেন। তিনি অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করে যে সম্পদের সন্ধান পেলেন তার বিষয়বস্তু অবলম্বন করে লিখলেন রায়বেঁশেদের এক জয়গাথা রাইবিশে নামে—

আয় মোরা সবাই মিশে খেল্‌বো রাইবিশে...নহে ঘৃণ্য জিনিস এ—মহা মূল্য জিনিস এ—আয় রে দশ-বিশেল ; চল্লিশে ; ছিয়াল্লিশে ; ভয় কিসে ?

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারি সবই মূলত একটি সূক্ষ্ম নিরাকার শক্তির স্পন্দনমাত্র। এই স্পন্দন ছন্দমূলক। গুরুসদয় দত্ত এই ছন্দানুভূতির একটি স্বরূপ তুলে ধরেছেন তাঁর রচিত মানুষ দল গানে—

আমরা মানুষ দল— এই ভুবনের ছন্দে মোরা আনন্দ-উৎফল...

ব্রতচারী আন্দোলনকে ইউরোপে প্রচার করতে গিয়ে তিনি ইউরোপীয় ছন্দে তুলে ধরলেন ব্রতচারীর মর্মকথা। তাঁর রচিত ইংরেজি গান IF YOU WANT এর বাংলা গান চাস যদি-র মধ্য দিয়ে।

চাস যদি গড়তে শরীরকে তোর—সুন্দর আর সুঠাম
চল্ তবে আয় ধেয়ে, দে যোগ্ ঝট্‌পট্—ব্রতচারীর দলে...

ব্রতচারীর পঞ্চব্রতের সাধনার মধ্য দিয়েই মনের হবে মুক্তি, উপলব্ধি হবে সমগ্র জীবনের। তাঁর রচিত চল হই গানে আমরা পাই—

ব্রতচারী দেহের শক্তি—মনের মুক্তি গড়ে ;
চল ভাই মোরা ব্রতচারী—হই সব ত্বরা করে...

ব্রতচারীর আদর্শে আছে, প্রত্যেক বিশিষ্ট জাতির নিজস্ব বৈচিত্র্যময় সৎকৃষ্টি বিকাশের সাধনা-পন্থার নির্দেশ এবং বিশ্বমানবের সেবা-ধর্মের প্রতি নির্দেশ। 'ব্রতচারী নাম' গানে তারই অভিব্যক্তি ঘোষিত হয়েছে—

মোরা গরব করি—ধরে ব্রতচারী নাম—
সকল বয়সে করি—নৃত্য ও ব্যায়াম...

ছন্দের অভ্যাস যে করেনি, তার জীবন অপূর্ণ, অন্তর্বিরোধময়। ব্রতচারী প্রণালীর মধ্যে ছন্দ-সাধনা বিদ্যমান। ব্রতচারী না হলে তাই পূর্ণ মানুষ হওয়া যায় না। তিনি 'হয়ে দেখ' গানে বললেন—

ব্রতচারী হয়ে/দেখ—জীবনে কি মজা ভাই
হয়নি ব্রতচারী যে সে—আহা কি বেচারিটাই...

গুরুসদয় দত্ত বাঙালিকে নিবিড়ভাবে আত্ম-প্রবুদ্ধ, আত্ম-গৌরব-সচেতন ও আত্মনির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থ ও সংহত করে তুলতে সৃষ্টি করেছিলেন মাতৃপ্রেমের আরাব—'জয় সোনার বাংলার'—'জ-সো-বা'। বাংলার সংহতির সঙ্গে

সঙ্গে ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশের মানুষকে নিয়ে বর্তমান যুগের মহাশক্তিশালী 'মহাভারত' গড়তে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন মাতৃপ্রেমের আরাব 'জয় সোনার ভারতের'—'জ-সো-ভা'। পাশাপাশি বিশ্বের সবর্স্তরের মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন মাতৃপ্রেমের আরাব 'জয় সোনার ভুবনের'—'জ-সো-ভু'।

সারি শব্দের অর্থ শ্রেণিবদ্ধ একদল কর্মরত মানুষের সমবেত সঙ্গীত। কর্মের সঙ্গে নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলে এ জাতীয় গানকে কর্মসঙ্গীত বলা হয়। কর্মজনিত শ্রম লাঘব, উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি, চিত্ত বিনোদন ও শক্তি অর্জনের জন্য সমবেত কণ্ঠে এ গান গাওয়া হয়। তাই তিনি সৃষ্টি করলেন।

কাইয়ে ধান খাইল রে—খেদানের মানুষ নাই
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ—কামের বেলায় নাই...
ওরে ও পাড়াতে পাটা নাই, পুতা নাই—মরিচ বাটে গালে...

এই গানটির মধ্য দিয়ে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের কথা, শোষণের কথা বলেছেন। এখানে 'কাইয়ে' অর্থাৎ 'কাকে'। এই কাক অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকদের বোঝাতে চেয়েছেন, 'পাটা' নাই 'পুতা' নাই। অর্থাৎ 'শিল নোড়া' নাই। শিল নোড়া মেরে ব্রিটিশ শাসকদের তাড়ানোর কথা বলেছেন এবং 'মরিচ' অর্থাৎ 'লঙ্কা' ঘষে দেওয়ার কথা বলেছেন। এইভাবে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনকে তরুণ সমাজের মধ্যে প্রবাহিত করেছিলেন।

তিনি ব্রতচারীদের কানে দিয়েছিলেন সমস্ত বাধা-বিপত্তি চূর্ণ করে এগিয়ে যাবার মন্ত্র—চল চল চল—বিঘ্ন বাধায় না রাখি ডর...

কিছুদিন পর তিনি আবার লন্ডনে যান। সেখানে ইংল্যান্ড লোকনৃত্য ও লোকগীতি রক্ষা সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এলবার্ট হলের এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ গান্ধিজি ঐতিহাসিক ডান্ডি অভিযান সংগঠিত করেন। ৬ এপ্রিল লবণ-আইন-ভঙ্গ আন্দোলনের উপর লাঠিচার্জ ও গুলি চালানোর হুকুম দেওয়ার জন্য ময়মনসিংহের জেলাশাসক গুরুসদয় দত্ত-র কাছে জরুরি বার্তা আসে। কিন্তু তিনি সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করেন। শাস্তিস্বরূপ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ময়মনসিংহ ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে ১২ এপ্রিল এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করে LEAVE MYMENSING AT ONCE. এরপর গুরুসদয় দত্তকে বীরভূমে বদলি করা হয়। তাঁর চাকুরি নথিতে তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন—SUCH A DISOBEDIENT OFFICER SHOULD BE TERMINATED. গভর্নর জেনারেল সমস্ত দিক বিবেচনা করে মন্তব্য করেছিলেন—MANAGE THE CASE SOMEHOW. DON'T CREATE ANOTHER SUBHAS.

১৯৩১ সালে বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সমিতির কাজ ছিল মূলত লুপ্তপ্রায় লোকনৃত্য—লোকগীতি এবং লোকশিল্পীদের অনুসন্ধান এবং চর্চার মাধ্যমে তার সংরক্ষণ। এই সময় তিনি বীরভূমের লুপ্তপ্রায় রায়বেঁশে নৃত্যের পুনরাবিষ্কার করেন। ব্যক্তিগত পরিশ্রম, উদ্দীপনা ও অধ্যবসায়ে সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন পট, কাঠপাথরের মূর্তি, হাঁড়ি, কলসি, আলপনা, দেওয়াল চিত্র প্রভৃতি। এই বৎসর তিনি আরও একটি যুদ্ধনৃত্য আবিষ্কার করলেন। এটি যশোহরের জেলার ঢালিনৃত্য। বীরভূম থেকে আবিষ্কার করলেন কাঠিনৃত্য। লোকনৃত্য ও সঙ্গীতের প্রচার ও প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির-এর ব্যবস্থা করেন। ১৯৩২ সালের ৪ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিন সপ্তাহের একটি লোকনৃত্য শিক্ষাশিবির বঙ্গীয় পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির উদ্যোগে সিউড়ি শহরের হেতমপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি (২৩ মাঘ ১৩৩৮) সিউড়িতে এই লোকনৃত্য শিবিরে শিবিরবাসীদের উদ্দেশ্যে গুরুসদয় বললেন, জীবনকে স্বভূমির ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও তাকে একটা পবিত্র ব্রতরূপে গ্রহণ করে সুসংবদ্ধ ও গভীর আদর্শের সাধনার ভিতর দিয়ে কর্মজীবনে প্রকাশ করার একান্ত প্রয়োজন। শিবিরে সমবেত শিক্ষার্থীগণ তাঁর এই মহান প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে ব্রত আচরণের শপথ গ্রহণ করেন এবং গুরুসদয় দত্তকে গুরু পদে বরণ করে নেন। সত্যিকারের মানুষ গড়ার গুরু হলেন গুরুসদয় দত্ত। গুরুসদয় দত্ত তাঁর নব প্রচেষ্টার নাম দেন 'ব্রতচারী'।

তাঁর মতে, মানুষের জীবনকে সবদিক থেকে সকল প্রকারে সফল, সার্থক ও পূর্ণতাময় করে তুলবার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যাঁরা একাগ্রচিত্তে, কায়মনোবাক্যে ব্রত পালন করেন তাঁরাই 'ব্রতচারী'। তিনি 'ব্রতচারী আন্দোলন'-এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের কোমল হৃদয়ে স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেন। ঘোষিত হল এই ব্রত গ্রহণের কথা। জন্ম হল জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ। সংক্ষেপে জ্ঞা-শ্র-স-ঐ-আ। এই পঞ্চব্রতকে কেন্দ্র করে জীবনকে দেশের সেবায় নিয়োজিত সংঘ ব্রতচারী। সূচনা হল আদর্শ মানুষ গড়ার আন্দোলন। অল্পদিনের মধ্যে ব্রতচারী আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি ভারতকে ভালোবাসি। আমি বাংলার সেবা করব, আমি ভারতের সেবা করব এবং অখণ্ড বাংলাভিত্তিক স্লোগান ছিল 'জয় সোনার বাংলা'—সংক্ষেপে জ-সো-বা।

যখন সবাই বহির্বিপ্লবে মেতে রয়েছে, যাদের একমাত্র লক্ষ্য বিদেশি ইংরেজদের দেশ থেকে বিতাড়ন করা, তখন তিনি শুরু করলেন অভ্যন্তরীণ বিপ্লব বা নিজেকে জানার বিপ্লব, নিজেকে আদর্শ স্বদেশপ্রেমী হিসেবে গড়ে তোলার বিপ্লব। হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টিতে বঙ্গ ভারতের বুকে এই ব্রতচারী ভিন্ন আর কোনো প্রতিষ্ঠান এত ব্যাপক সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকারের

চোখে যিনি 'ANOTHER SUBHAS' সেই গুরুজি তৎকালীন বাংলার গভর্নর SIR JOHN ANDERSON-কে ব্রতচারী সমিতির মহাপালক মনোনীত করেন। ফলে ব্রতচারী আন্দোলন পেল দুর্বার গতিধারা। সেই ধারা আজও অব্যাহত।

১৯৩৩ সালে গুরুজিকে কেন্দ্রীয় বিধানসভার সভ্য মনোনীত করে দিল্লিতে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি গঠন করেন নিখিল ভারত লোকনৃত্য সমিতি। বিভিন্ন লোকনৃত্য দলগুলোকে বৃত্তি ও পুরস্কার দিয়ে তিনি সেগুলি উদ্ধার ও পুনঃচর্চার ব্যবস্থা করেন। বিদ্যালয়গুলিতে এগুলির অনুশীলনেরও ব্যবস্থা করেন।

১৯৩৪-এ আবার বদলি। এবার কলকাতার শিল্প বিভাগের অধিকর্তা হিসাবে। এরপর তিনি বহু সরকারি দফতরের সচিব হয়েছিলেন। অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি বর্ধমান বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই বছরেই 'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি'-র নাম পরিবর্তন করে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করা হল 'বাংলার ব্রতচারী সমিতি' নামে।

শরৎ বসুর বাড়িতে গান্ধিজি ও শিশির বসুর সামনে ব্রতচারীরা এক অভিপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন ১৯৩৭ সালের ১৫ নভেম্বর। নেতাজি অসুস্থ থাকায় কোনও বক্তব্য দিতে পারেননি, কেবল চোখে-মুখে হৃদয়ের আবেগ ও আনন্দানুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল।

গান্ধিজি বলেছিলেন, 'তোমরা এখানে এসে তোমাদের অঙ্গচালনা কৌশল এবং কৃত্যালীর পরিচয় দিয়েছ, এজন্য আমি দত্ত মহাশয়কে এবং তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি, এ জিনিসটা আমার কাছে নূতন; যদিও অনেক আগেই আমার এ সম্বন্ধে জানা উচিত ছিল। যে মাতৃভূমি তোমাদের নিকট এত প্রিয় তার সেবায় তোমাদের জীবনকাল সুদীর্ঘ হোক।

রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৭ সালের ২৭ ফাল্গুন গুরুসদয় দত্তকে রায়বেঁশে পুনরাবিষ্কারের জন্য আশীর্বাদ জানিয়ে চিঠি লিখলেন, 'বিদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার আর একটি যে অধ্যবসায় দেখলুম তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে। দেশের স্বাস্থ্য এবং অন্নের সংস্থান খুবই জরুরী সন্দেহ নেই—কিন্তু আনন্দের প্রকাশ তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়।

দেশের সাধারণ বলতে যাদের বোঝায় সেই পল্লীবাসীরা তাদের নৃত্যে-গীতে-কাব্যকলায় অজস্রভাবে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করেছে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জলকুণ্ডের মতো এখনও তার অবশেষ দেখা যায়, কিছুদিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা আছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মূঢ়তা তার অন্যতম কারণ। আমরা গ্রন্থকীট, দেশের গভীর প্রাণ প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। তিনি আরও বলেন, আমরা ইংরেজি স্কুল বয়—সেই জন্যে পুঁথির নজির অনুসরণ করে বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পন্ডিতী করতে আমাদের উৎসাহ, কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে জনসাধারণের মধ্যে যেসব সৌন্দর্য প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরুপণ করতে পারি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নৃত্য। সরস্বতীর এই মহাদানকে আমাদের ভদ্রসমাজে অবজ্ঞা করে পেশাদারের ঘরে ঠেলে দিয়েছে—জনসাধারণের মধ্যে আড়ালে-আবডালে কিছু কিছু আছে সঙ্কোচে—আপনি তাকে অখ্যাতি থেকে মুক্ত করে সর্বজনের মধ্যে তার আসন করে দেবার চেষ্টা করছেন, এ একটা বড় কাজ। সকল রকম আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগরুক করে রাখে ; মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না—আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে যায়। আপনি পল্লীর পুরাতন রায়বেঁশে নাচকে নতুন আবিষ্কার করেছেন ; এ রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। এই নাচ-এর উৎসাহকে আপনি ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন। পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকলা পৌরুষের সহচরী। আমাদের দেশেরও চিত্তদৌবল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য। তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক। সার্থক হোক।'

বিশ্বভারতীতে কবিগুরু, গুরুসদয় দত্তকে রায়বেঁশে ও অন্যান্য নৃত্য দেখাতে আহ্বান জানান। তিনি নৃত্য দেখে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হয়ে বিশ্বভারতীতে রায়বেঁশে নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে এবং তাঁর রচিত 'নবীন' নাটকে গুরুসদয় রচিত গীতিনৃত্য পদ্ধতি যুক্ত করতে মনস্থ করেন।

রায়বেঁশে নাচের বৈশিষ্ট্য হল, নাচের মাধ্যমে বিভিন্ন রণকৌশল প্রদর্শন। শরীরচর্চার ক্ষেত্রে এই নাচের তুলনা নেই। গুরুসদয় দত্ত তাই রায়বেঁশে নাচকে ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করে দিলেন।

সৃজনাত্মক শ্রমের পাশে তিনি আবার খাড়া করেছেন ধ্বংসাত্মক শ্রমকে। যা কিছু অস্বাস্থ্যকর, যা কিছু জাতীয় জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে তাকে বিনাশ করতে হবে। কচুরিপানা গ্রাস করছে বড়ো বড়ো দীঘি ও পুষ্করিণীকে। কচুরিপানার আড়ালে মশার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে নির্মমভাবে। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামে গ্রামে। মৃত্যুর হাতছানি সেই পিশাচির চোখে। পল্লিতে পল্লিতে পানীয় জলের ভীষণ অভাব। গুরুসদয় দত্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন না। নিজে তিনি তো কোমরবেঁধে নামলেন পানা সাফ করতে, সেই সঙ্গে লিখলেন গান—চল আয় কচুরি নাশি...।

মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক, সফল ও পূর্ণময় করে তোলবার জন্য গুরুসদয় দত্ত 'পঞ্চব্রতের' কথা বলেছিলেন। যিনি এই পাঁচটির প্রত্যেকটি পালন করতে দৃঢ় সংকল্প করেছেন ও জীবনে কায়মনোবাক্যে এই পঞ্চব্রত পালন করবার জন্য সরলভাবে আচরণ করে থাকেন, সেই পুরুষ-নারী-বালক-বালিকাকেই ব্রতচারী বলা হয়। ব্রত অর্থাৎ নিয়মরূপে অনুষ্ঠিত সৎকর্ম এবং চারী অর্থাৎ গমনশীল।

ব্রতচারীর পরিচয় আরও স্পষ্ট করে জানানোর জন্য তিনি ব্র-ত-চা-রী এভাবে ভাগ করে করে প্রতিজ্ঞা করেন—

ব্র ত লয়ে সাধব মোরা বাংলা সেবার কাজ
বাংলা সেবার সাথে সাথে ভারত সেবার কাজ
ভারত সেবার সঙ্গে বিশ্ব-মানব সেবার কাজ
ত রুণতার সজীব ধারা আনব জীবন মাঝ
চা ই আমাদের শক্ত দেহ মুক্ত উদার মন
রী তিমত অনুসরণ করব প্রতি পণ।

গুরুসদয় গানের সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা জানতেন বলেই ব্রতচারী আন্দোলনকে গানে গানে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রচুর গান লিখেছিলেন। গান গাইতে গাইতে কাজ—এই ছিল তাঁর অন্যতম উপজীব্য।

প্রত্যেক জাতি তাদের জাতীয় জীবনে শ্রমের মর্যাদাকে সকলের উপর স্থান দিয়েছে এবং নারীজাতিকে দিয়েছে দাসত্ব থেকে মুক্তি। জাতির দাসত্ব মোচন করতে হলে, স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে হলে কর্ম ও জ্ঞানের মিলন ঘটাতে হবে। তাই তিনি নারীর স্থানে বলেছিলেন করে ঘর বাহিরের কর্ম—মোরা পাল্‌ব নারীর ধর্ম—সেবা-ব্রতের পুণ্য প্রভাব—পরব অভয় বর্ম—

ব্রতচারী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি গুরুজি বাংলার লোকশিল্পের উৎপাদন ও নমুনা সংগ্রহের কাজও করতে থাকেন। সংগ্রহ করতে করতে তাঁর লোকশিল্প সংগ্রহের সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার দাঁড়িয়ে গেল। এই সব অমূল্য সম্পদ থাকত তাঁর বাসভবনে। তিনি তার নাম দিলেন 'ব্রতচারী সংগ্রহশালা', যা আজ ঠাকুরপুকুর ব্রতচারীগ্রামে 'গুরুসদয় সংগ্রহশালা' নামে পরিচিত।

গুরুসদয় দত্তের লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল লোকসংস্কৃতি চর্চায় স্বতন্ত্র এক গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা। যেখানে থাকবে লুপ্তপ্রায় লোকনৃত্য, লোকগীতি, লোকশিল্পের গবেষণার ব্যবস্থা। থাকবে সংগ্রহশালা। সেই কারণেই তিনি বাংলার ব্রতচারী সমিতির পক্ষে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে ১৯৪০ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রায় ৩১ হাজার টাকায় ১০১ বিঘা জমি কেনেন কলকাতার দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবার রোডের ধারে ঠাকুরপুকুরের কাছে জোকা গ্রামে। নাম দেন ব্রতচারীগ্রাম। এই বছর ২২ সেপ্টেম্বর জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জানান সাংবাদিকদের। তিনি জানান এখানে থাকবে (১) পাঠ বাড়ি (বিদ্যালয়) (২) সাধনা বাড়ি (ব্যায়ামাগার) (৩) কারিগর বাড়ি (৪) চাষ বাড়ি (৫) পুঁথি বাড়ি (পুস্তকাগার) (৬) সেবা বাড়ি (গ্রামোন্নয়ন) (৭) চারুশিল্প এবং (৮) সংগ্রহ বাড়ি (মিউজিয়াম)।

গুরুজি ছিলেন অখণ্ড স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা, প্রস্তাবকারী এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ। তিনি জানতেন যে একদিন এটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। তাই আগে থেকেই নামকরণ করেছিলেন বাংলাদেশ। আর এই বাংলাদেশ নামে তিনি সুদীর্ঘ নব্বই লাইনের একটি গানও লিখেছিলেন।

গুরুসদয় দত্তের সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসাবে সরকার তাঁকে কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে সি-আই-ই খেতাব দেওয়া হয়নি। অথচ প্রধান আই-সি-এস অফিসার এবং যাঁরা সরকারি দফতরের সচিবের পদ অধিকার করেন, তাঁদের প্রত্যেককেই সি-আই-ই খেতাব দেওয়া হয়। এটা প্রায় একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুরুসদয় দত্তের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে, কারণ তিনি সরকারের সু-নজরে ছিলেন না।

১৯৩৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর নবম নিখিলবঙ্গ ব্রতচারী উপশীলন শিবিরে যোগদানের মাধ্যমে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন শিল্পী কামরুল হাসান।

গুরুজি জানতেন নীতি, নিয়ম ও শৃঙ্খলা না থাকলে কোনো আন্দোলনই সফল হতে পারে না। তাই তিনি ব্রতচারীদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন বিভিন্ন নিয়মকানুন, পণ ও প্রতিজ্ঞা, 'ষোলো আলি'। 'আলি' কথাটি একটি ব্রতচারী পরিভাষা। এটা ক্রিয়া অথবা অনুষ্ঠান অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রতচারীর জীবনের সমগ্র অনুষ্ঠান ষোলোটি আলিতে বিভক্ত করা হয়েছে। ষোলো আলির প্রথম আলি আবৃত্তালি। সংযত চিত্তে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে উক্তি, ব্রত, পণ, মানা, প্রণিয়ম, প্রণীতি, সংকল্প প্রভৃতি ছন্দবদ্ধ আবৃত্তি সাধনা। কায়মনোবাক্যে এইরূপ নিয়মিত সাধনার ফলে ওইগুলি মনোবৃত্তির অঙ্গীভূত হবে এবং আত্মগঠনের সহায়তা করবে। তৈরি করেন ভূমি প্রেমের তিন উক্তি—যাঁরা সেবা করার জন্য আগ্রহান্বিত হন তাঁদের জন্য। ছোটোদের জন্য করলেন বারো পণ। বয়স্ক ব্রতচারীর উদ্দেশ্যে ষোলো পণ। এর মধ্যে শারীরশিক্ষা, কর্মশিক্ষা এবং সমাজ সেবার অবশ্যকরণীয় কর্তব্যগুলি বিদ্যমান। পাশাপাশি তিনি ব্রতচারীদের সতর্ক করলেন সতেরো মানার মাধ্যমে।—এছাড়া ব্রতচারীকে কয়েকটি প্রণিয়ম গ্রহণ করতে হয়। যেমন-'ব্রতচারী ক্রমবৃদ্ধির কামনা'। ব্রতচারী জীবনের ক্রমবৃদ্ধি স্বীকার করে। ক্রমবৃদ্ধি না মানলে জীবন অস্বীকার করা হয়। গুরুজী লিখলেন 'চতুবর্গ'। উদ্দেশ্য, সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ জীবন গঠন। সৃষ্টি করলেন 'ব্রতচারীর সাধনা পর্যায়'। কারণ, ব্রতচারীর সর্বপ্রধান লক্ষ্য হবে চরিত্রকে ঠিক রাখা। তারপর সংঘ ও নৃত্য। আমরা দেখলাম ব্রতচারীর সর্বশেষ সাধনা নৃত্য। নৃত্য না করলে জীবনকে পূর্ণতম করা যায় না; নৃত্যের অভাবে পঞ্চব্রতের শেষ ব্রত 'আনন্দ' অঙ্গহীন হয়। কিন্তু অসমর্থ হলে নৃত্য না করলেও ব্রতচারীর চলতে পারে। কৃত্য ও নৃত্য নিয়ে ব্রতচারীর জীবনের 'পূর্ণ-বৃত্ত'। ব্রতচারীর নৃত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি সাধারণ নৃত্য থেকে ভিন্ন; তাই ব্রতচারী নৃত্যের স্থান কৃত্যের মধ্যে।

কৃত্যালি: ষোলো আলির দ্বিতীয় আলি কৃত্যালি। কৃত্য অর্থে যা করা উচিত। যে কাজে সর্বসাধারণের উপকার হয় সেই শ্রেণির কাজের দলবদ্ধভাবে সাধনাকে কৃত্যালি বলা হয়।

সঙ্গীতালি: ষোলো আলির তৃতীয় আলি সঙ্গীতালি। সঙ্গীত দেহের ক্লান্তি দূর করে; মস্তিষ্ক সবল ও সুস্থ করে।

মানুষের সৃজনী শক্তির বিকাশের বিভিন্ন ধারাগুলির অন্যতম সঙ্গীত। তাই গুরুজি সঙ্গীতকে একটি আলিতে যুক্ত করেছেন। ব্রতচারীর নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সুসমঞ্জস সাধনা—নৃত্যালি, গীতালি ও বাদ্যালি এর বিভিন্ন শাখা। সাহিত্য-সঙ্গীত-কলাবিহীন: সাক্ষাৎ পশু: পুচ্ছ-বিষাণহীন: (ভর্তৃহরী-নীতিশাসক)।

ক্রীড়ালি: চতুর্থ আলি ক্রীড়ালি। ক্রীড়া বা খেলাধুলা মানসিক ক্লান্তি দূর করে এবং দৈহিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ব্রতচারী ক্রিয়াপদ্ধতিতে সব খেলাধুলা অঙ্গীভূত করা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলার গ্রামীণ খেলাধুলার প্রচলনের দিকে বেশি নজর দেন।

গ্রামীণ ক্রীড়াগুলির পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রবর্তন ব্রতচারী আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য, পাশাপাশি বিদেশি সকল রকম খেলাধুলা এবং ধাবনালি, ক্ষেপনালি ও লম্ফনালিকেও ব্রতচারী ক্রিয়াপদ্ধতির অঙ্গীভূত করেন। এর আবার দুটি শাখা। (১) স্ব-ক্রীড়ালি। অর্থাৎ জাতীয় ক্রীড়ালি। এর মধ্যে আছে হা-ডু-ডু, খো-খো, কবাডি ইত্যাদি। (২) অন্য ক্রীড়ালিতে আছে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি।

মল্লালী: পঞ্চম আলি মল্লালি। শরীর গঠনে ও আত্মরক্ষার জন্য এবং বিপন্নের উদ্ধারের পক্ষে মল্লালি সাধনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এতে শরীর বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম হয় এবং বিপদে ধৈর্যহানি ঘটে না। এর মধ্যে আছে কসরৎ, কুস্তি, ব্যায়াম, যোগাসন প্রভৃতি।

বীরালি: ষষ্ঠ আলি বীরালি। নিজের জীবন বিপন্ন করেও আর্তের সাধন বীরত্বের পরিচায়ক। এই সমপ্রাণতা ব্রতচারীর একটা সাধনা। তাই গুরুজী বীরালিকে তাঁর আলিতে যুক্ত করেছেন।

সেবালি: সপ্তম আলি সেবালি। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে হলে রোগীর প্রতি সহানুভূতি, রোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং রোগ-শুশ্রূষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাথমিক প্রতিবিধান, গৃহশুশ্রূষা প্রভৃতি বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা করা ব্রতচারী মাত্রেরই কর্তব্য।

শিল্পালি: অষ্টম আলি শিল্পালি। স্বহস্তে সৌন্দর্য সৃষ্টি। দৈনন্দিন জীবনে যেগুলি প্রয়োজন, এরূপ শিল্পালির চর্চা করা দরকার।

জ্ঞানালি: নবম আলি জ্ঞানালি। প্রতিদিন বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ব্রতচারীর কর্তব্য। যতদিন বাঁচব ততদিন বাড়ব, রোজ কিছু শিখব—রোজ দোষ ছাড়ব।

চাষালি: দশম আলি চাষালি। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে চাষের উন্নতির উপর দেশের সমৃদ্ধি নির্ভর করছে। তাই নিজের হাতে কৃষিক্ষেত্রে লাঙল চালনা, কোদাল চালনা, উদ্যান রচনা, ফল-ফুল-সবজির উৎপাদন ব্রতচারীর কর্তব্য।

দক্ষতালি: একাদশ আলি দক্ষতালি। অতীত জ্ঞানকে বাস্তবে রূপ দিতে, অতীতে ও বাস্তবে সংযোগ স্থাপন করতে দক্ষতালির প্রয়োজন হয়। গ্রন্থ রচনা, সন্তরণ, রন্ধন, আলোকচিত্র প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন ব্রতচারীর কর্তব্য।

সংধ্যানালি: দ্বাদশ আলি সংধ্যানালি। প্রত্যেক দিন কিছু সময় নীরবে একনিষ্ঠচিত্তে কোনো বিষয়ে একা অথবা অনেকে একসঙ্গে গভীর চিন্তা করা। এতে অন্তর্দৃষ্টি উন্মেষিত হয়, চিত্ত বলবান হয় ও আত্মার বিকাশ হয়। এর ফলে সকল ব্রতচারীরা একপ্রাণ ও একমন হয়ে ওঠার সাধনায় সফলকাম হতে পারে।

ফৌজালি: ত্রয়োদশ আলি ফৌজালি। এর ফলে শরীর গঠন, সংনিয়মন ও অনুশৃঙ্খলার সাধন ঘটে। সমগ্র জীবনকে একটি আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংগ্রামক্ষেত্র মনে করে প্রত্যেক ব্রতচারীকে শান্তিসেনা বা ফৌজি-ব্রতচারী সাজতে হবে। এজন্য ফৌজালির নিয়মাবলি দৈনন্দিন জীবনে পালন করা কর্তব্য। এতে শৃঙ্খলা ও তৎপটুতা এনে দেবে।

কথালি: চতুর্দশ আলি কথালি। এর জন্য সাধনার প্রয়োজন। অল্পকথায় মনের ভাব প্রকাশে দক্ষতা। ব্রতচারীদের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কথালির অনুষ্ঠান বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ভ্রমন্তালি: পঞ্চদশ আলি ভ্রমন্তালি। নানাস্থানে ভ্রমণ শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। নানা স্থানে গমন ও প্রাচীন কীর্তির সন্দর্শন দ্বারা মনে স্বাজাত্যবোধ আসে, মন উদার হয়, নানা স্থানের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে, লোকচরিত্র নির্ণয়ে দক্ষতা আসে।

কৌতুকালি: ষষ্ঠদশ তথা শেষ আলি কৌতুকালি। অনাবিল আনন্দপূর্ণ নির্মল কৌতুক, রসময় গল্প প্রভৃতি। উদ্দেশ্য আনন্দোৎসব সঙ্গীবন-কঠিন শ্রমের পর আনন্দ-পরিবেশন। অনাবিল আনন্দ উপভোগ করার জন্য ব্রতচারীরা মাঝে মাঝে মজলিশ করে থাকে।

১৯৪০-এর ১১ ডিসেম্বর গুরুসদয় সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত গুরুসদয় পরম উৎসাহে মেতে রইলেন তাঁর স্বপ্নের ব্রতচারী গ্রামকে পরিকল্পনামতো সাজিয়ে তুলতে। ব্রতচারী সংগ্রহশালার জন্য জায়গা চিহ্নিত করলেন। ব্রতচারীগ্রামকে নিয়ে রচনা করলেন নতুন নতুন গান। ব্রতচারী নামাঙ্কিত ইঁট তৈরি করে সংগ্রহশালার ভিত তৈরি হয়। ব্রতচারী গ্রামের দুটি দিক। একটি হল ব্রতচারীগ্রামের কর্মধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রতচারী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ব্রতচারী সংঘ গড়ে তুলবেন যা বাংলার ব্রতচারী সমিতির কেন্দ্রভবনের শিকড় ও কেন্দ্র ভবনের কর্মগতির সঞ্চারক হবে। ব্রতচারীগ্রামের আরেক দিক হল—হেথায় এসে বাংলাবাসী পাবে নবীন প্রাণ—ভারতবাসী হেথায় এসে হবে অভিন প্রাণ।—এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

যে মানুষটা ব্রিটিশ শাসকাধীন সরকারের একজন জেলাশাসক হয়েও সেই শাসকদের ভয় না পেয়ে বরং তাদেরকেই তিনি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, যে মানুষটা দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন, যে মানুষটা স্বাধীন ভারতবর্ষ দেখবার জন্য গ্রামের অলিতে-গলিতে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিলেন আমজনতার মধ্যে, না—সেই মানুষটার স্বাধীন ভারতবর্ষকে দেখবার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ১৯৪১ সালের ২৫ জুন ভোর ৬-১৫ মিনিটে গুরুসদয় দত্ত কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, তাঁর সমস্ত স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা সাধ আর অসমাপ্ত ব্রত বাংলার ব্রতচারী সমিতির হাতে সঁপে দিয়ে। বাংলার ব্রতচারী সমিতি সেই আন্দোলনকে আজও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুজির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

'দিও পরলোকে পরাগতি দান হে
প্রেমপূর্ণ পরমলোকে স্থান হে
দিও স্থান হে। দিও স্থান হে।
জয় জয় হে তব জয় জয় হে'।

তথ্যসূত্র :
ব্রতচারী পরিচেষ্টার স্ব-রূপ (প্রথম পর্ব)
ব্রতচারী পরিচয়—গুরুসদয় দত্ত
ব্রতচারী সখা—শ্রী গুরুসদয় দত্ত
BRATACHARI SYNTHESIS—GURUSADAY DUTT
FOLK DANCES OF BENGAL—GURUSADAY DUTT
গুরুসদয়—অমিতাভ চৌধুরী
স্বদেশপ্রেমী গুরুসদয়—শঙ্কর প্রসাদ দে

তমলুক সংগ্রহশালা

বাংলার মা-মাটি-মানুষের সম্পদ

ড. কমলকুমার কুণ্ডু

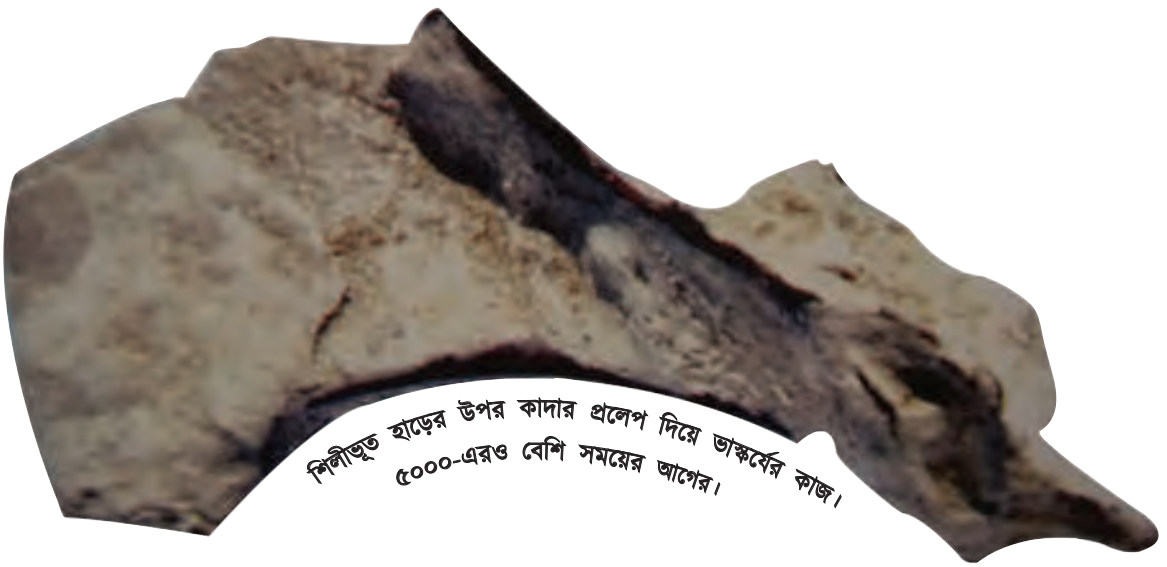

ফসিলীভূত হাড়ের উপর কাদার প্রলেপ দিয়ে ভাস্কর্যের কাজ।
৫০০০-এরও বেশি সময়ের আগের।

তমলুক রত্নগর্ভা এক প্রত্নক্ষেত্র। কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে ৩৫ মাইল এবং মেদিনীপুর শহর থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ৪১ মাইল দূরে ২২°১৭'৫০" উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৭°৫৭'৩০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর এই তমলুক। প্রাচীনকালের পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দর তাম্রলিপ্তির স্মৃতির ছায়ায় আচ্ছন্ন এই তমলুক। বৌদ্ধধর্মের একসময়ের অন্যতম পীঠস্থান তাম্রলিপ্ত বা বর্তমানের এই তমলুকের একদা সরস্বতী নদীর নিম্নপ্রবাহে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত।

মহাভারতের (আঃ ১৫০০-১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) 'তাম্রলিপ্ত', বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ (আঃ ৫০০-২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-র 'তমোলিপ্তি', বৃহৎসংহিতা (আঃ ৪র্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-র 'তাম্রলিপ্ত', মেগাস্থিনিসের বিবরণের (আঃ ৩০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) 'তালুক্তি', প্লিনি (আঃ খ্রিস্টীয় ১ম শতক)-র 'তালুক্তাই', টলেমি-র (আঃ ১৫০ খ্রিস্টাব্দ) 'ট্যামালিটেস', ফা-হিয়েনের (৪১১-১২ খ্রিস্টাব্দ) 'তমোলিপ্তি', হিউয়েন সাঙ্-এর (৬২৯ খ্রিস্টাব্দ) 'তান-মো-লি-তি', দন্ডির দশকুমার চরিত (৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে খ্রিস্ট জন্মের ২০ বছর আগের রচনা)-এর বর্ণনায় 'দামলিপ্ত', মঙ্গলকাব্যের বর্ণনায় (১৬শ শতক), 'তমলুক', নদী-বিশেষজ্ঞ ব্লেভ-এর মানচিত্রে (১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) 'তাম্বোলিন', বৌরি-র মানচিত্রে (১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ) 'তমালী' বা 'তোম্বলী', গ্যামেল্লি কারেরির মানচিত্রে (১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ) 'তাম্বোলিন', হেজেস এবং স্টেনশ্যাম মাস্টার (খ্রিস্টীয় ১৭ শতক)-এর বর্ণনায় যথাক্রমে 'তুম্বোলি' আর 'তুম্বারলিন', ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু কাগজপত্রে (১৭৬৮ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত সময়ে) 'তামলুক' বা 'তুমলুক', উমাচরণ অধিকারী (১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ) ও ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত (১৯০২)-দের ইতিহাসের বইতে 'তমোলুক' এবং পরিশেষে সেবানন্দ ভারতীর লেখায় 'তমলুক' হিসেবেই পরিচিত এই বৌদ্ধ ও বন্দর নগরীর।

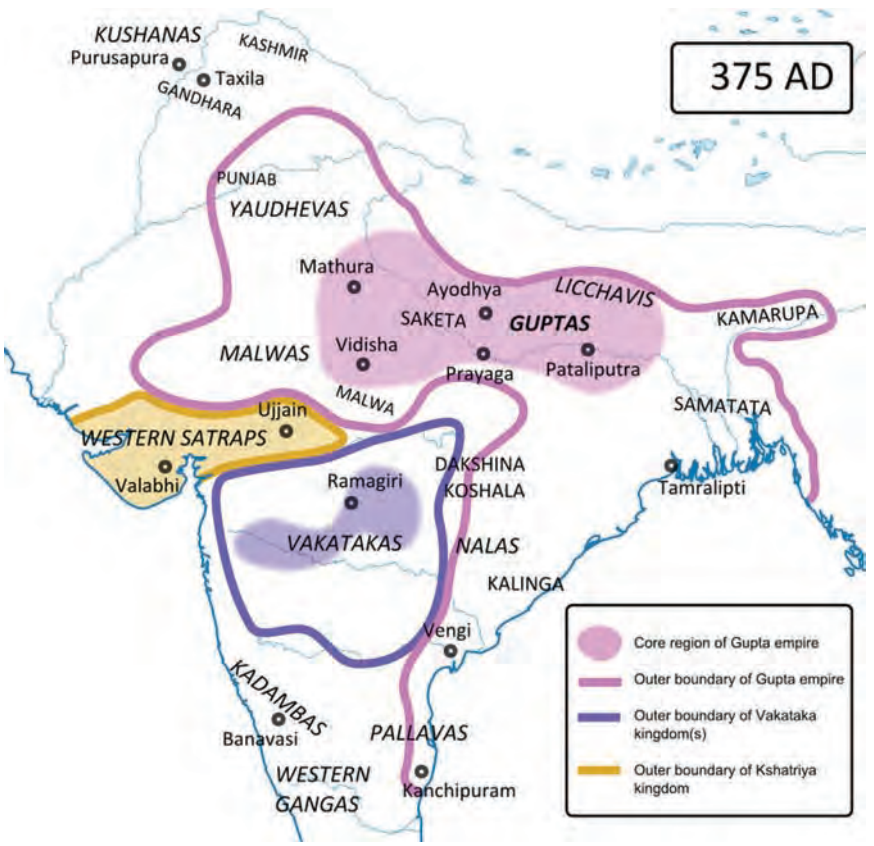

খ্রিস্টীয় ১ম-২য় শতকের সমস্ত বিবরণে তাম্রলিপ্তি ছিল এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর। শুধু ভারতেরই নয় এশিয়ার সর্ববৃহৎ এই বন্দরের অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। ড. রাধাকুমুদ মুখার্জি তাঁর 'ইন্ডিয়ান শিপিং' বইতে বললেন, "By far the most important emporium of ancient Bengal was Tamralipta, the great Buddhist harbour of the

Bengal seaboard. It is referred to in the Mahavamso (ch. XIX) as Tamalitta and... the place is of great antiquity and existed prior to the days of Asoka, for it figures even in the sacred writing of the Hindus...” বিদেশি বণিকরা জাহাজযোগে তাম্রলিপ্তে এসে এখানকার নানান দুষ্প্রাপ্য জিনিস যেমন রেশম, কার্পাসবস্ত্র, তেজপাতা, সোনা, রুপা, হিরা, মুক্ত ইত্যাদি সংগ্রহ করে ফিরে যেত নিজের দেশে। তাম্রলিপ্তির বহির্বাণিজ্যের এই প্রবহমান ধারা বজায় ছিল উনবিংশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত, তার বিবরণ রাখতে গিয়ে হান্টার সাহেব তাঁর ‘ওড়িশা’ গ্রন্থে (১৮৭২ খ্রিঃ) লিখলেন যে—“... Indigo, mulberry, and silk, the costly product of Bengal and Orissa, form the traditional articles of export from ancient Tamluk; and although the sea has long since left it, the town continued until 1869 the great maritime outlet of Orissa.” পেরিপ্লাসের বর্ণনায় ‘কোন্দালিয়া’ নামের যে জাহাজ বঙ্গোপসাগর পাড়ি জমিয়ে চলে যেত সিংহল আর চিন দেশে, ম্যাক্রিন্ডিল সাহেবও একথায় সায় জানিয়েছেন। এই কোন্দালিয়া যাত্রা শুরু করত তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। পঞ্চম শতকের চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁর ভারতভ্রমণের (৪০০-৪১২ খ্রিস্টাব্দ) শেষ দুবছর বৌদ্ধধর্মের শিক্ষালাভে বৌদ্ধনগরী ‘তমোলিপ্তি’-তে অতিবাহিত করে এখান থেকেই এক বাণিজ্য জাহাজে চড়ে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন সিংহল হয়ে। ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তির অবস্থান সমুদ্রের মুখে বললেও তাঁর ২০০ বছর

ব্যবধানে আসা সপ্তম শতকের অপর চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্, যিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাচীন তাম্রলিপ্তি ও তার মানুষজন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে বললেন, 'এ রাজ্যটিও সাগরকূলে (সমুদ্র খাঁড়ির উপর)'। ভূমি নিচু ও সরস। নিয়মিত চাষবাসের কাজ হয়। দেদার ফুল ও ফলের ছড়াছড়ি। আবহাওয়া গরম ধাঁচের। লোকজনেরা চটপটে ও ব্যস্তবাগীশ। বেশ পরিশ্রমী ও সাহসী। দশটার মতো সংঘারাম-এ হাজার জনের কাছাকাছি বৌদ্ধভিক্ষু। দেবমন্দির প্রায় পঞ্চাশটি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে মিলেমিশে বাস করেন। প্রচুর পরিমাণে নানারকম দামি দামি পণ্যসামগ্রী ও রত্নাদি এখান থেকে সংগ্রহ করা হয়। এজন্য এখানকার লোকেরা সাধারণভাবে বেশ ধনী। ১৪০০-১৫০০ লি আয়তনের তাম্রলিপ্ত রাজ্যটির রাজধানীর আয়তন সমুদ্রখাঁড়ির উপর বৃত্তাকারে ১০ লি। এর কাছাকাছি সম্রাট অশোকের নির্মাণ করা একটি বৌদ্ধস্তূপ।' সম্রাট অশোকের ১৩ নং রক এডিক্ট খবর দিচ্ছে যে তিনি তাম্রলিপ্ত নগরের প্রান্তভাগে কলিঙ্গযুদ্ধের বিজয়সূচক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সিংহলি বৌদ্ধগ্রন্থ 'দীপবংশ' (খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক) এবং 'মহাবংশ' (খ্রিস্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতক) খবর দিচ্ছে রাঢ় (বাংলা)-এর অধিপতি সিংহবাহু রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে নিজপুত্র বিজয়বাহুকে নির্বাসন দিলে তিনি তাম্রলিপ্তে এসে তাম্রলিপ্ততে তৈরি করা ৩টি জাহাজে চড়ে ৭০০ জন সঙ্গী নিয়ে সিংহলে উপস্থিত হয়েছিলেন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের দিন (আঃ খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৪ শতক) এবং পরে সেখানকার রাজা

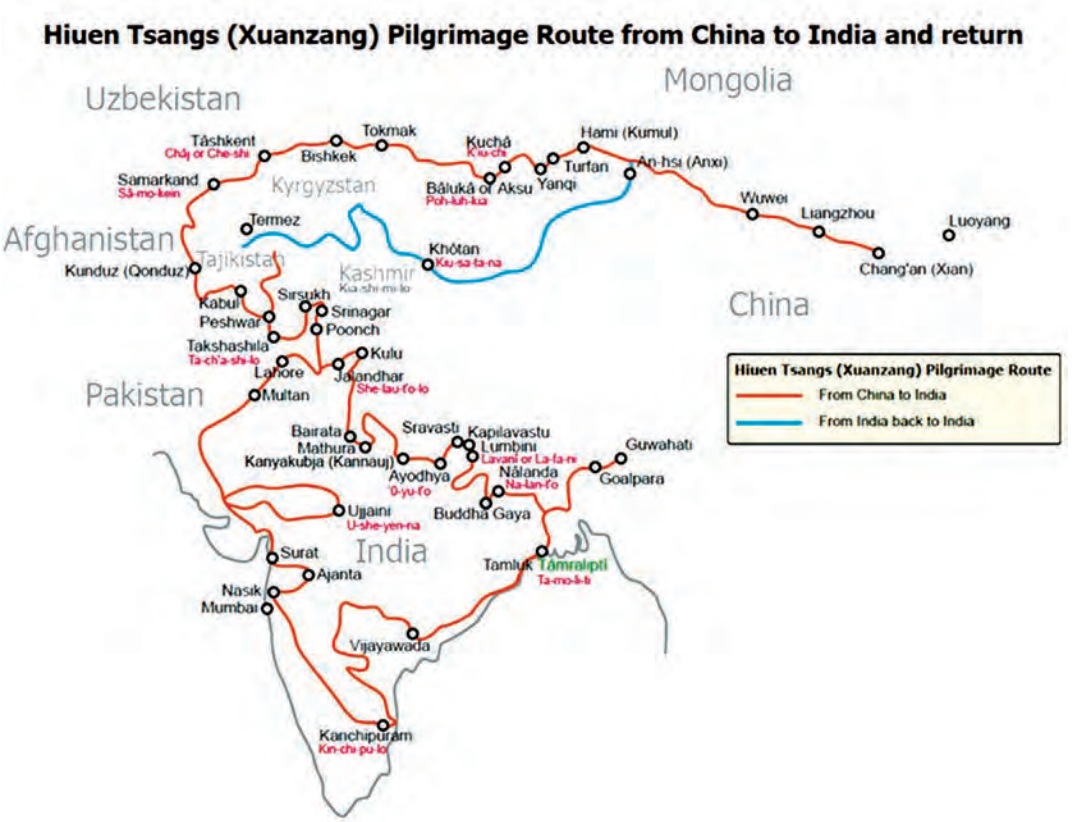

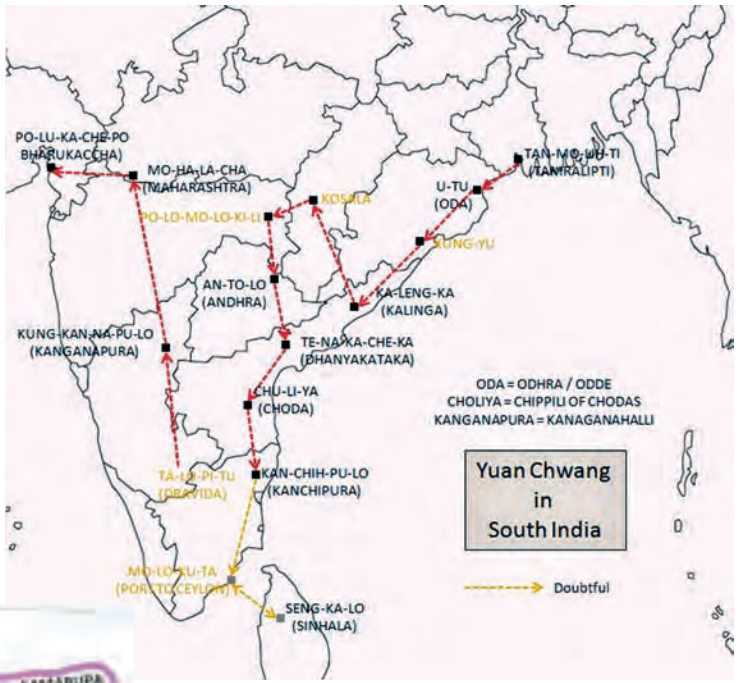

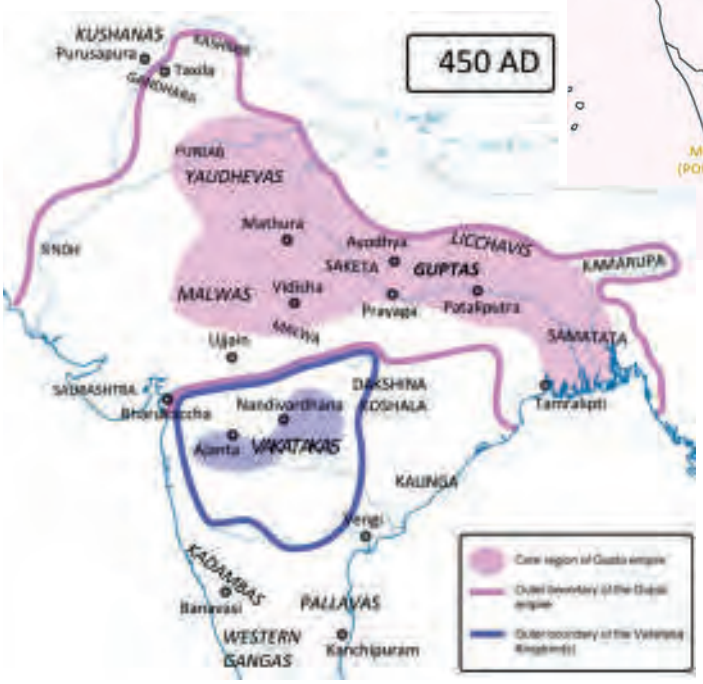

একদিকে সম্মুখে সমুদ্র এবং অন্যদিকে নদীপথে ভারতের নানান প্রান্তের সঙ্গে সাবলীল যোগাযোগে তাম্রলিপ্তি হয়ে উঠেছিল অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র।

হয়েছিলেন। হাজারিবাগ জেলায় পাওয়া ৮ম শতকের দুধপাণি শিলালেখ থেকে জানতে পারা যাচ্ছে যে সেখানকার তিনজন বণিকভাই তাম্রলিপ্তিতে বাণিজ্য করতে এসে ধনবান হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন নিজের দেশ অযোধ্যায়। একদিকে সম্মুখে সমুদ্র এবং অন্যদিকে নদীপথে ভারতের নানান প্রান্তের সঙ্গে সাবলীল যোগাযোগে তাম্রলিপ্তি হয়ে উঠেছিল অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্র। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রায় ১০০ বছর আগে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের কিছু আগে লেখা জগমোহন পণ্ডিতের 'দেশাবলী বিবৃতি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাম্রলিপ্তির স্থান নির্ণায়ক বর্ণনায় বললেন :

"মণ্ডল ঘট্ট দক্ষিণে চ হৈজলস্য হ্যুত্তরে।
তাম্রলিপ্তো হি দেশশ্চ বনিজাং চ নিবাস ভূঃ॥ ৪৮॥
দ্বাদশ যোজনৈর্যুক্ত রূপানদ্যাঃ সমীপত।
..."

অর্থাৎ হিজলীর (কাঁথি মহকুমা) উত্তর দিকে এবং মণ্ডলঘাট পরগনার (শহর তমলুকের কাছে রূপনারায়ণ নদের

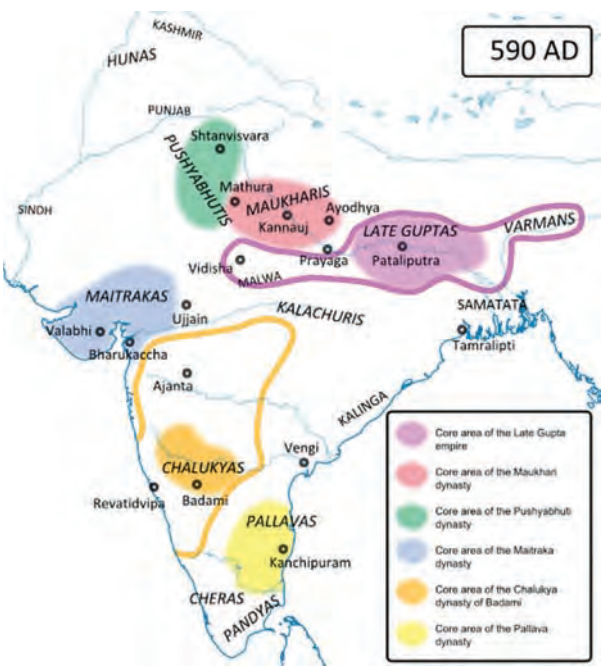

উল্টোদিকে হাওড়া জেলায় মণ্ডলঘাট পরগনা) দক্ষিণদিকে রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী এলাকায় ১২ যোজন বিস্তৃত এলাকায় বণিকদের আবাসনভূমি তাম্রলিপ্তির অবস্থিতি। অর্থাৎ বর্তমান তমলুক এলাকা। সাবেক দিনে এই তমলুকে পৌঁছতে কলকাতা থেকে হোরমিলার কোম্পানির ঘাটাল অভিমুখী স্টিমারে অথবা নৌকা চড়ে হুগলি ডিঙিয়ে মোহনায় রূপনারায়ণ নদে ঢুকে আসতে হত দীর্ঘ জলপথ বেয়ে। পরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েজের হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে প্রথমে পাঁশকুড়া রেলস্টেশনে নেমে কিছুদিন উটের গাড়িতে এবং তারপর বাসযোগে আসতে হত। বর্তমানে পথ কমিয়ে মেছেদা রেলস্টেশনে নেমে সরাসরি বাসযোগে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় তমলুকে।

অতীতের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বৌদ্ধ-বন্দর নগরীর চেহারা কেমন ছিল তা কালের গতিতে চাক্ষুষ করবার সুযোগ আমাদের নেই। তবে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানি আমলে তমলুকে সল্ট এজেন্সি চালু হলে আধুনিক তমলুকের নগরায়ণের শুরু। এই সময়কার এবং এর একশ বছর ব্যবধানের তমলুক তথা তাম্রলিপ্তের চেহারা কেমন ছিল তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন দুজন বিদেশি—একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী আর্থার উইলিয়াম ডেভিস, অন্যজন হাওড়া ব্যাপটিস্ট মিশনের যাজক তথা

তমলুকে আধুনিক নগরায়ণের শুরু। জমি হস্তান্তর উপলক্ষে জমিদার রাজা আনন্দনারায়ণ রায় এবং উইলিয়াম ডেন্ট (বাঁদিক থেকে)! চিত্রাঙ্কন উইলিয়াম ডেভিস — ১৭৯০

চিত্রকর উইলিয়াম কেরি। ১৭৮৩-তে তমলুকের সল্ট এজেন্ট হয়ে এসেছিলেন উইলিয়াম ডেন্ট। পারিবারিক এক বিবাদে তমলুকের জমিদার রাজা আনন্দনারায়ণ রায়কে সাহায্য করার পুরস্কার হিসেবে সল্ট এজেন্সির কাজের সুবিধার জন্য কিছু জমির বন্দোবস্ত চাইলেন উইলিয়াম ডেন্ট। বিনিময়ে আনন্দনারায়ণও তমলুক আবাসবাড়ি মৌজায় বাণপুকুর (Baul Pokhra) এলাকায় বহতা রূপনারায়ণ নদের তীরে ৫টি আলাদা আলাদা প্লটে মোট ১৭ একর আয়তাকার একখণ্ড জমি স্বল্প কিছু বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে বন্দোবস্ত দিলেন উইলিয়াম ডেন্ট-কে। ব্রিটিশ ফিওফমেন্ট আইন অনুযায়ী (দুজন সাক্ষীর সামনে মাটি কেটে হস্তান্তর) জমি হস্তান্তরের ঘটনাটিকে প্রমাণে আনবার জন্য ছবি আঁকতে উইলিয়াম ডেন্ট আর্থার উইলিয়াম ডেভিসকে আনিয়েছিলেন ১৭৯০-তে। ডেভিস-এর আঁকা দুটো ছবি থেকেই আমরা চাক্ষুষ করতে পারি পুরোনো তাম্রলিপ্তের অংশবিশেষকে।

প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে বর্তমানের বাণপুকুর ও এই পুকুরের এক কোণায় (বর্তমানের রেডক্রশ অফিসের পাশে) একটি নিমগাছের তলায় গাঢ় তাম্রবর্ণ রঙের কোট আর হালকা হলুদের চোখা (আঁটো পায়জামা) পরা দণ্ডায়মান উইলিয়াম ডেন্ট। তাঁর বামদিকে মিলিটারি পোশাকে টকটকে লাল রঙের কোট চাপিয়ে নিজের ভাই বেঙ্গল ইনফ্যান্ট্রির সৈনিক (ঘটনার সাক্ষী হতে দাদার কাছে এসেছিলেন) জন ডেন্ট দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ডানদিকে সাদা ঢলা লম্বা আংরাখায় (গাউন) মোড়া জমিদার রাজা আনন্দনারায়ণ রায় হাতে জমি হস্তান্তরের দলিল নিয়ে উপস্থিত এবং এদের তিনজনের পিছনে দাঁড়িয়ে ঢাল-তলোয়ার হাতে ডেন্ট সাহেবের অর্ডারলি। পিছন দিয়ে চলে গেছে একটি প্রসারিত রাস্তা (বর্তমান যে রাস্তাটি রেডক্রশ ভবনের পাশ দিয়ে এগিয়ে জেলা কৃষি দপ্তরের দিকে গেছে) ডেন্ট-এর বাড়ি ও কাছারির দিকে। ওদের সামনেই কোদাল নিয়ে মাটি কেটে ঝুড়িতে রাখবার সময়ে ঝুঁকে থাকা এক শ্রমিকের দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে বাঁদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করছেন ভাই জন ডেন্ট-কে দাদা উইলিয়াম ডেন্ট। প্রসারিত রাস্তার প্রায় গা-ঘেঁষেই কুলকুল করে বয়ে চলা রূপনারায়ণ নদের বক্ষে ভেসে যাওয়া বহতা নৌকা। ডেভিস-এর আঁকা দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি পিপল গাছের (গাছটি কিছুদিন আগেও ছিল রেডক্রশের দিকের রাস্তার উল্টোদিকে বর্তমান ভূমিলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক এবং মুনসেফ কোয়ার্টার্স-এর মধ্যবর্তী জায়গায়) গোড়ায় পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে বসে আছেন উইলিয়াম ডেন্ট-এর স্ত্রী লুইসা। লুইসার পরনে সুন্দর সাদা পোশাক আর

উইলিয়াম ডেভিসের ছবি থেকে তমলুকের বাণপুকুর ও তার পাড়ে উইলিয়াম ডেন্টের পুত্র ও কন্যা সহ স্ত্রী লুইসা এবং লবণের অফিস

রূপনারায়ণ নদের তীরের দিক থেকে শহর তমলুক আর দেবী বর্গভীমার মন্দির : ধর্মযাজক উইলিয়াম কেরীর স্কেচ — ১৮৮৮

সঙ্গে কমলা রঙের সিল্কের কুঁচি দেওয়া সবজে-নীল রঙের পশমের আলোয়ান। অদূরে ডেন্ট-এর দোতালা পাকা বাড়ি ও কাছারি। এরই পাশে বাণপুকুরের একদিকের পাড়ে (এখন যেখানে আবাসবাড়ি ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের দুর্গাপূজা হয়, ওখান থেকে কৃষি অফিস পর্যন্ত রাস্তা বরাবর) সারি সারি মাটির আর খড়ের ছাউনির কাছারিবাড়ির অনেকগুলি ঘর। এগুলির সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি গরু এবং পাঁচটি হরিণের একটি দল। জায়গাটির পাশ দিয়ে ডেন্ট-এর বাসগৃহের গাঘেঁষে বহতা রূপনারায়ণ।

ডেন্ট সাহেবের পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের ওপর ছবি দুটি আলোকপাত করলেও ২২৭ বছর আগের তমলুকের রূপ কেমন ছিল তার একটা রূপরেখা আমরা পেয়ে যাই। দ্বিতীয় বিদেশি চিত্রকর হলেন হাওড়া মিশনের ধর্মপ্রচারক উইলিয়াম কেরি। ডেভিস-এর প্রায় ১০০ বছর পরে ১৮৮৮-তে প্রকাশিত হওয়া কেরির 'এ মিশনারি ট্যুর ইন দি হুগলি অ্যান্ড হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট (লোয়ার বেঙ্গল/ইন্ডিয়া)' বইতে ১৮৮৮ সালে ধর্মপ্রচারের জন্য এসে উলুবেড়িয়া হয়ে গেঁওখালি ডিঙিয়ে রূপনারায়ণ বেয়ে ঘাটাল যাওয়ার পথে তমলুকের যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং একটি অসামান্য স্কেচ-এ তমলুকের যে ছবি মুদ্রিত করে গেছেন সমসাময়িক কালের তমলুকের, তা এক অনন্য দলিল। পুরোনো তাম্রলিপ্তর চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেরির ওই স্কেচ থেকে দেখা যাচ্ছে তমলুক শহর লাগোয়া রূপনারায়ণ নদ থেকে বর্গভীমা মূল মন্দিরের পিছনের দিক এবং তার সম্মুখের জগমোহন প্রতিভাত হচ্ছে। মন্দিরের পিছনে নদের চড়ায় মাটির একটা বাড়ি। বর্গভীমা মন্দির থেকে কোটপাড়া পর্যন্ত গাছগাছালি ভরা রাস্তা বরাবর নদ তটের ওপরেই সারি সারি খড়ের চালের মাটির বাড়ি। এক-আধটা টিন ছাওয়া বাড়িও হয়ত থেকে থাকবে। নদের ঘাটে বাঁধা দুটি নৌকা।

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি লবণ উৎপাদন শুরু করলে তমলুক পরিণত হয় একটি 'নিমকমহাল'-এ। এই সময় থেকেই আধুনিক তমলুকের নগরায়ণের শুরু। লবণের কারবারকে কেন্দ্র করে বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, মায় ঠাকুরবাড়ির দ্বারকানাথ, গোপীমোহন প্রমুখ মানুষজন আর আশপাশের জেলাগুলি থেকে বহু শিক্ষিত রাজকর্মচারীগণের সমাগম ঘটতে থাকল এই তমলুকে। লবণের সঙ্গে সঙ্গে রেশম এবং নীল ব্যবসায়ে তমলুক তখন জমজমাট। ক্রমে গড়ে উঠেছিল তমলুক মুনসেফি আদালত (১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ), শুরু হল তমলুক মহকুমার কাজ (১৮৫২-তে)। এর ১২ বছর পর অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় তমলুক পুরসভার

শুরু হয়েছিল ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল। এই নগরায়ণের ঐতিহ্য একদিনের নয়, বহুদিনের। পুরানো দিনের তমলুকের উন্নত মানের সমাজজীবন, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন, রাজনৈতিক জীবন ইত্যাদির কথা ধরা ছিল 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র'-র প্রদর্শকক্ষে তাম্রলিপ্ত পৌরসভার বিনে পয়সার দেওয়া দুটি কামরার প্রদর্শকক্ষে (১৯৭৩-২০০০), যা বর্তমানের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার 'তমলুক মিউজিয়ামে'র জিম্মায়।

তমলুক মিউজিয়ামের কাজকর্ম ১৯৭৩-এ হলেও এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন ১৯৭৫-এর ১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্ত পৌরসভার প্রদর্শকক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় আরও এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখার্জি এবং ভারতের কনস্টিটিউয়েন্ট আসেমব্লির মাননীয় সদস্য এবং সাংসদ সতীশচন্দ্র সামন্তকে সঙ্গে নিয়ে। কয়েক মাস পর ১৯৭৬-এর ৩ মে তারিখের এক মতামত চিঠিতে শ্রীরায় সেদিনের মিউজিয়াম দর্শনের অভিজ্ঞতার নিরিখে বললেন :

"আদিযুগের বন্দরনগরী তাম্রলিপ্ত এক মহান ঐতিহ্যে মহিমান্বিত। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের থেকে ধর্ম, দর্শন ও শিক্ষানুসন্ধানী পণ্ডিতপ্রবরদের শুভানুগমন ঘটেছিল রূপনারায়ণের তীরবর্তী প্রাক্-ঐতিহাসিক এই তাম্রলিপ্ত নগরীতে। খৃস্টপূর্বাব্দ থেকেই তাম্রলিপ্ত বা বর্তমান তমলুক ভারতবর্ষের সঙ্গে মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি যোগসূত্র রক্ষা করত। সুপ্রাচীন এই শহরটি পূর্বভারতের ধর্মার্থীদের কাছেও ছিল এক অতি পবিত্রভূমি।"

"তাম্রলিপ্ত রত্নগর্ভা। তাম্রলিপ্ত ভূমিতে প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতির নিদর্শন স্বাভাবিক কারণেই থাকবে। তাম্রলিপ্তের বুকে সুপ্ত রয়েছে হাজারো অজানা ঘটনার স্বাক্ষর। খুবই আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়, তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র এই ঐতিহাসিক স্থানে এইসব অতি মূল্যবান নিদর্শনগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের আয়োজনে ব্রতী হয়েছে।"

"আমি আশা করি, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকদের অনুসন্ধানের ফলে আরও মূল্যবান তথ্য ও নিদর্শনাদির সন্ধান এখানে মিলবে এবং তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা বিশ্বের মানুষের কাছে একদিন এক অতি আকর্ষণীয় সংগ্রহশালায় পরিণত হবে।"

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রর প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্নবস্তু সংগ্রহের পেছনে ছিল তমলুক থেকে প্রাপ্ত কিছু সংগ্রহবস্তুর দুর্নিবার আকর্ষণীয় হাতছানির প্রেক্ষাপট। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে স্বনামধন্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মৌর্যযুগে প্রচলিত 'পুরাণ' নামের কিছু রৌপ্যমুদ্রা পেয়েছিলেন তমলুক থেকে। ঠিক এর পাঁচ বছর পর তমলুকের প্রথম ইতিহাসকার হ্যামিল্টন হাইস্কুলের শিক্ষক উমাচরণ অধিকারী ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) লেখা তাঁর বই 'তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ'-এ প্রবহমান রূপনারায়ণ নদের তটরেখায় তমলুকের মানুষজনের প্রত্নবস্তু খোঁজার উন্মাদনার কথা ধরে রেখেছেন। তিনি বললেন :

"আমরা প্রতিদিন নদতটে গমন করিয়া দেখিতাম কোথায়ও কূপশ্রেণি ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি স্তরে স্তরে শোভা পাইতেছে ; কোনো স্থলে মানবদেহের কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট একটি মূর্তি দর্শকমণ্ডলীর মনোমধ্যে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতেছে, যেন কোন যোগী পদ্মাসনে আসীন হইয়া মুদ্রিত নেত্রে ধ্যান করিতে করিতেই আপনার আত্মাকে পরমাত্মাতে বিসর্জন প্রদান করিয়াছেন।"

এই উন্মাদনার আবেশে মেদিনীপুর জেলার কালেক্টর উইলসন সাহেব তমলুকের মহকুমা শাসক উমেশচন্দ্র বটব্যালকে সঙ্গে নিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতকের কিছু মুদ্রা পেয়েছিলেন তমলুক থেকে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ; এরই সঙ্গে

অপরূপ সৌন্দর্যে পোড়ামাটির বুদ্ধমস্তক : গুপ্তশৈলী, আঃ ৬ষ্ঠ শতক

পাওয়া গিয়েছিল কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সময়কার একটি তাম্রমুদ্রা। এর ২ বছর পর ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের একটি দিনে মহকুমা শাসকের নিজের বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া রূপনারায়ণ নদের তীর থেকে এক অমূল্য প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেছিলেন তমলুকের মহকুমা শাসক গৌরদাস বসাক। তাঁর একজন খানসামার কুড়িয়ে দেওয়া ভাঙা ৪টি টুকরো থেকে তিনি পেয়েছিলেন ভারতীয় পোড়ামাটি শিল্পের ইতিহাসে অনন্য সংযোজন—মৌর্য শিল্পশৈলীতে রূপায়িত যৌবনগর্বিতা, অলঙ্কারভারগ্রস্তা আত্মসচেতনা 'পঞ্চচূড়া যক্ষিণী'-র এক বিশ্ববন্দিতা অনন্যসাধারণ মূর্তি। শ্রী বসাক এই মূর্তিটিকে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে দান করেন। ১৮৮৮-র ডিসেম্বর মাসের ওদেরই কার্যবিবরণীতে তাঁর 'Notes on four Buddhist copper coin' নামের প্রবন্ধে মূর্তিটির ব্যাখ্যায় বললেন, "I think, to refer the clay figure under consideration of sometime in the Buddhist history of Tumlook. The images strongly resembles the females of Buddhist culture." মূল্যবান এই প্রত্নবস্তুটি লন্ডনের অক্সফোর্ড ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট-এ নিয়ে চলে যান অধ্যাপক মনিয়ের উইলিয়াম ওদের দেশের মিউজিয়ামের সংগ্রহবস্তু হিসেবে, তাঁর ১৮৮৮-র পরে পরেই কলকাতা পরিভ্রমণকালে। তারপর এই অনুপম মূর্তিটি সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে ওঠে 'অক্সফোর্ড যক্ষিণী' হিসেবে। বিংশ শতাব্দীর বিশ-এর দশকের শুরুতেই রাখালদাস ব্যানার্জি এবং দয়ারাম সাহানী-র নেতৃত্বে মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পায় উৎখননে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের ফলশ্রুতিতে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রত্নবস্তু অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রত্নবিজ্ঞানীরা। ১৯৩৫-এ প্রত্নতাত্ত্বিক টি. এন. রামচন্দ্রন, বিংশ শতকের '৪০-এর দশকে ব্রতচারী আন্দোলনের পুরোধা গুরুসদয় দত্ত, আই.সি.এস, প্রত্নবিদ রমাপ্রসাদ চন্দ, এবং '৫০—৬০-এর দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট-এর সহকারী অধ্যক্ষ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত (পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টর অফ আর্কিওলজি) স্থানীয় উৎসাহী টুনুবাবুকে (হৃষীকেশ মুখার্জি) সঙ্গে নিয়ে ঢুঁড়ে ফেললেন তমলুক শহর এলাকা। এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় তমলুকের প্রত্নবস্তুতে ভরে উঠল আশুতোষ মিউজিয়াম, জোকার ব্রতচারী গ্রামের গুরুসদয় সংগ্রহশালা এবং তমলুকের "সতীস্মৃতি" সংগ্রহালয়। এই অনুসন্ধান পর্বের পর ১৯৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তাদের পূর্বাঞ্চলীয় অধীক্ষক শ্রদ্ধেয় এম. এন. দেশপাণ্ডের নেতৃত্বে খননকাজ শুরু হয় তমলুকে। উন্মোচিত হয়েছিল তাম্রাশ্রয়ী যুগের প্রত্নসামগ্রী সহ মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে গুপ্তযুগ পর্যন্ত টেরাকোটা শিল্পের বহু প্রত্নসামগ্রী। এই অমূল্য প্রত্নবস্তুগুলির সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ছাড়া বিস্তারিত বিবরণ আজও প্রকাশিত হয়নি শুধু নয়, এগুলি এখনও সার্ভের কাছে বস্তাবন্দি। তবুও এইসব সংগ্রহপর্বের আলোকদ্যুতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু হয় তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের স্থাপনা পর্ব।

বেদির ওপর সালংকারা দেবী (পোড়ামাটি); আঃ খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক

আসলে তমলুক এমনই এক জায়গা যেখানে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বেই এর এক উজ্জ্বল উপস্থিতি। ঐতিহাসিক পর্বে যেমন আছে প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের ইতিহাসের নানান বাতাবরণ, তেমনই এই পর্বের আগে আদি ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক পর্বেও তমলুক অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণময় উপস্থিতি—তাম্রাশ্মীয়

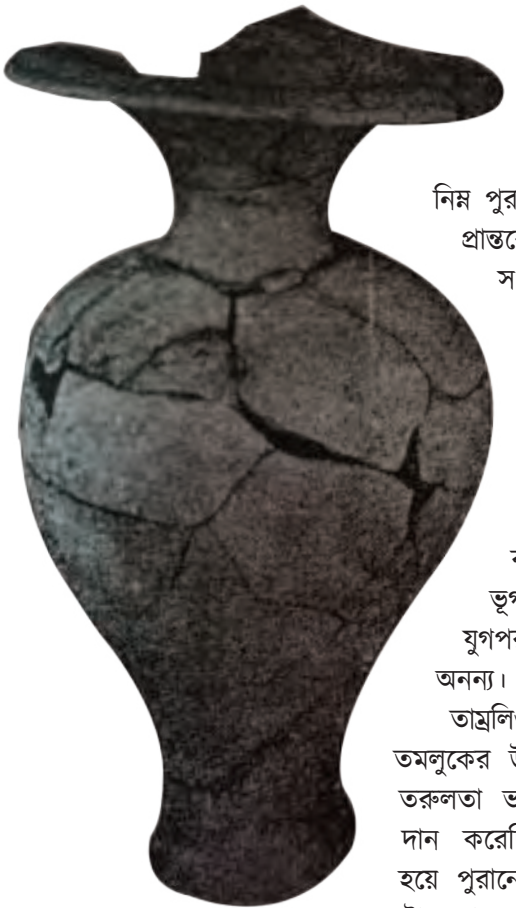

পোড়ামাটির ফুলদানির গায়ে লাল রঙের চিত্রায়ণ তাম্রাশ্মীয় যুগ

(Chalcolithic), নবাশ্মীয় (Neolithic) পর্ব ছাড়িয়ে সভ্যতা গড়িয়ে গিয়েছে আরও দূর অতীতে ক্ষুদ্রাশ্মীয় (Mesolithic), উচ্চপুরাপ্রস্তর (upper palaeolithic), মধ্যপ্রস্তর (Middle palaeolithic) এমনকি নিম্ন পুরাপ্রস্তর (Lower Palaeolithic) যুগের অসম্ভবনাময় অধ্যায়ের রহস্যময় প্রান্তরে। এমনিতেই ইন্ডিয়ান ফোক্‌লোর পত্রিকার ১৯৫৮-র জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নৃতাত্ত্বিক ডঃ তারাশিস মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নিওলিথিক ইমপ্লিমেন্টস ফর্ম তাম্রলিপ্ত' প্রবন্ধে তাম্রলিপ্ত তথা তমলুকের নবাশ্মীয় সভ্যতার উন্মেষের কথা বলেছেন। পরে ১৯৭৩-এ 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপনের সময় সংগ্রহশালার অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর আলোকে উদ্বেল হয়ে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তমলুকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন-এর ৪৬তম অধিবেশনের স্মারক গ্রন্থে প্রত্নবিজ্ঞানী পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁর এক লেখায় মন্তব্য করলেন, "আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার অদূরে এবং একটি ইতিহাসখ্যাত নৌ-বন্দরের ভূগর্ভে এই নবাশ্মীয় অধিবসতির উপস্থিতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীত যুগপরম্পরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র পূর্ব-ভারতীয় উপকূলে অনন্য। ...তাম্রলিপ্তের ইতিবৃত্ত আজ আরও আলোকিত।"

তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্রর প্রথম সংগ্রহবস্তু কিছু পুঁথি। শহর তমলুকের উপান্তে ব্যবর্তাহাট-এর অশীতিপর বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ পরিবারের এক কন্যাশ্রী তরুলতা ভট্টাচার্য ছেলেদের নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে বাড়ির প্রায় ৫০টি পুঁথি দান করেছিলেন সংগ্রহশালাকে। ছেলেদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, পুঁথিগুলি জীর্ণ হয়ে পুরানো হয়ে গেছে বলেই সংগ্রহশালাকে দিয়ে দিচ্ছেন। মরিয়া প্রতিরোধের চেষ্টায় মাকে বলেছিলেন, 'তোমারও তো বয়স হয়ে গেছে তাই বলে তোমাকে কি আমরা কাউকে দিয়ে দিচ্ছি'। প্রত্যুত্তরে মা ছেলেদের বলেছিলেন, 'এই সংসারে তোমরা আমার দেখভাল করবে বলেই আমি এখানে ভালো থাকব, পুঁথিগুলোকে ভালো করে রক্ষণাবেক্ষণের জায়গা হল মিউজিয়াম, তাই এগুলি ওখানেই দিয়ে দিচ্ছি।' ছেলেরা আর কিছু বলতে পারেননি। আর বৃদ্ধার ওই অসাধারণ কথার শিক্ষা আমাদেরকে পরবর্তীতে প্রত্নানুসন্ধানে প্রেরণা জুগিয়েছে। ত্রিশ বছরের সময়ের গণ্ডিতে অনুসন্ধান চালিয়ে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের ভাণ্ডারে মূল্যবান অজস্র প্রত্নবস্তুর সমারোহ। প্রকৃতই একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রজ্ঞা নিয়ে ১৯৮২-তে তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে এসে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বললেন যে, "গত ২০/২৫ বৎসরে যে অমূল্য প্রত্ন সম্পদ আবিস্কৃত হয়েছে তমলুক তার একটি বড় অংশীদার। সেই সম্পদ বাঙালি জাতির গর্বের বিষয়।"

গোলাকার শিলীভূত হাড়ের ওপর আবছা পোড়ামাটি রঙের চিত্রণ ৫০০০-এরও বেশি বছরের পুরানো।

সংগ্রহশালার সংগ্রহবস্তুর তালিকায় টেরাকোটা প্রত্নসামগ্রীর অজস্র বৈচিত্রময় সম্ভার উজ্জ্বলতায় প্রাধান্য পেলেও হাড়ের তৈরি দুটি খাঁজকাটা হারপুন (barbed harpoon) এবং একটি মাছ ধরার বঁড়শি (fish hook) বর্ণময় সংযোজন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তদানীন্তন উপ-সমাহর্তা বি.কে. থাপার বিংশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে সংগ্রহশালা পরিদর্শনে এসে মৎস্য শিকারের এই উপাদানগুলিকে 'প্রায় ৪০০০ (চার হাজার) বছর আগের নবাশ্মীয় পর্বের কোনো

এক সময়ের শৈল্পিক মনের মানুষের তৈরি বলে মন্তব্য করেছিলেন।' হাড়ের এই বৃহদায়তন বঁড়শি ভারতের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনাবলির সমারোহে একক। নবাশ্মীয় পর্বের এই নিদর্শনগুলি ছাড়া পুরাতন প্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্বের অমসৃণ পাথরের অস্ত্রাদি, নবাশ্মীয়-তাম্রাশ্মীয় যুগের পাথরের মসৃণ অস্ত্রশস্ত্র, হাড়ের তৈরি নানান প্রসাধন সামগ্রী, নানান ধরনের প্রতীকী চিহ্নসংবলিত হাতে তৈরি মৃৎপাত্রগুলি তদানীন্তন লোকশিল্পীদের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিরই দ্যোতনা। প্রত্নবস্তুগুলি উন্মোচিত করেছে প্রত্নইতিহাসেরই এক নতুন দিগন্ত। এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় অসংখ্য হাড়ের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র—তিরের ফলা, ছুরি ইত্যাদি।

এই প্রত্নবস্তুগুলির সঙ্গে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ নব্যপ্রস্তর ও তাম্রাশ্মীয় পর্বের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বহুসংখ্যক চিত্রিত মৃৎপাত্রগুলি। এইগুলি সেই সময়কার মানুষের সৌন্দর্যপ্রিয়তার স্মারক প্রত্নবস্তুসমূহ। এগুলির নির্মাণশৈলী দুই ধরনের—হাতে তৈরি এবং চাক ঘুরিয়ে তৈরি; গ্লাস, বড় বাটি, নলযুক্ত লোটা, থালা, জগ এবং জল রাখবার পাত্র। আবার এগুলিকে পোড়ানোর ধরনের ভিত্তিতে ও মৃৎপাত্রগুলিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়—লাল রঙা মৃৎপাত্র, ধূসর রঙের মৃৎপাত্রসমূহ, কালো এবং লাল রঙা, লালকালো রঙের মৃৎপাত্র, লাল-কালো রঙা মৃৎপাত্রগুলির ওপর সাদা রঙের চিত্রায়ণ, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল, এবং উত্তরভারতীয় কৃষ্ণবর্ণীয় (এন.বি.পি.) এই কৌলালগুলি নবাশ্মীয়, তাম্রপ্রস্তর এবং লৌহযুগের। কখনও কখনও নৌকা, তারা, মাছ, ফুল ইত্যাদি গোলগোল ছিদ্র আঁকাবাঁকা করে খোদাইয়ের মাধ্যমে অথবা চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে মৃৎপাত্রগুলির গায়ে প্রতিভাত করা হয়েছে। 'রুলেটেড ওয়্যার' (মৃৎপাত্রগুলির মাঝখানে গোলগোল চক্রাকারে খোদাই) কিংবা বিস্তৃত পোড়ামাটির ফুলদানির গায়ে লাল রঙ দিয়ে চিত্রায়ণের কাজে বিদেশি প্রভাব-এর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

বেশ কিছু সিলমোহর এই সংগ্রহশালার গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ। মুখ্যত পোড়ামাটির হলেও কিছু আছে পাথরের বা হাড়ের। কিছু কিছু সিলমোহরে আছে মৌর্যযুগের ব্রাহ্মীভাষার প্রাথমিকপর্বের লিপিমালায় খোদাই করা।

সীলমোহরগুলি আছে ধারাবাহিকভাবে শেষ মধ্যযুগীয় সময়কাল

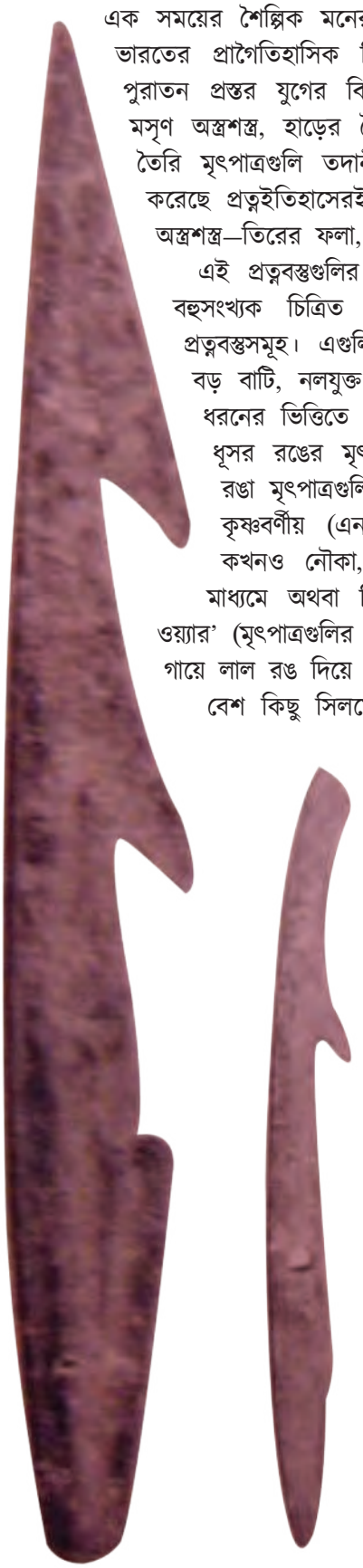

পোড়ামাটির লালরঙা মদ বা অন্য তরলপদার্থ জমিয়ে রাখবার মৃৎপাত্র (রোমদেশীয় অ্যাম্ফোরা) খ্রিস্টীয় — ১ম-২য় শতক

পর্যন্ত। এখানকার একটি পোড়ামাটির ফলকে খরোষ্ঠি এবং হাড়ের তৈরি ধর্মীয় উপকরণে খরোষ্ঠিব্রাহ্মী হরফে লেখমালার বিবরণের অনুপ্রেরণায় নিম্নগাঙ্গেয় এলাকায় অনেকগুলো ফলকের সন্ধান পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'এগুলি যে শুধু খরোষ্ঠি বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে তাই নয়, খ্রিস্টীয় প্রথম থেকে পঞ্চম শতক অবধি প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণা বদলে দিয়েছে।' তিনি প্রথম ফলকটিতে উপমহাদেশের অন্য প্রান্ত থেকে আগত এক বণিকের সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার উল্লেখ করে তাকে চিহ্নিত করেছেন 'দক্ষ-ঘোড়ার মালিক' হিসেবে। এই ঘটনাই মূর্ত করে তোলে লিয়াংশু আর 'কাং-তাই'-এর বর্ণনা—মধ্য এশিয়ার ঘোড়া তাম্রলিপ্তিতে আমদানি হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি হওয়ার কাহিনি। দ্বিতীয়টিতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হীনযান সম্প্রদায়ের মানুষদের এক মিলনসভার ক্ষেত্রের কথা, স্মরণ করিয়ে দেয় বৌদ্ধ তাম্রলিপ্তির। এমনই একটি সংগ্রহবস্তু পোড়ামাটির একটি মূর্তির বেদিতে ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখার (খ্রিস্টীয় ১ম-২য় শতক) পাঠোদ্ধার করেছিলেন তমলুক সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের কিউরেটর প্রশান্তকুমার মণ্ডল, যেখানে লেখা ছিল 'স-ম-ন-ক-লি-৩', যা একটি বৌদ্ধভিক্ষুর নাম।

পোড়ামাটির ফলকে খরোষ্ঠি লিপি : খ্রিস্টীয় ১ম-২য় শতক

সংগ্রহশালার আরও এক সমৃদ্ধ প্রত্নসম্পদ হল মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে শেষ মধ্যযুগ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মুদ্রা। রুপা, তামা, লোহা এবং সিসা দিয়ে তৈরি এই সব মুদ্রা। মুদ্রা তৈরির শুরুর সময়ের রুপা ও তামা দিয়ে তৈরি 'পাঞ্চমার্কড কয়েন' (যন্ত্র দিয়ে ছাপ দেওয়া মুদ্রা), পরবর্তী সময়ের তামার ঢালাই করা বা ছাঁচে তৈরি আয়তাকার, বর্গাকার এবং গোলাকৃতি শুঙ্গ-কুষাণ পর্বের মুদ্রাগুলির ওপর নানান ধরনের প্রতিকৃতি—ধনুকের মতো পাহাড় চূড়ায় অর্ধচন্দ্র, গাছ, বেড়ার সঙ্গে গাছ,

তমলুক সংগ্রহশালার পাঞ্চমার্কড কয়েন (মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগ)

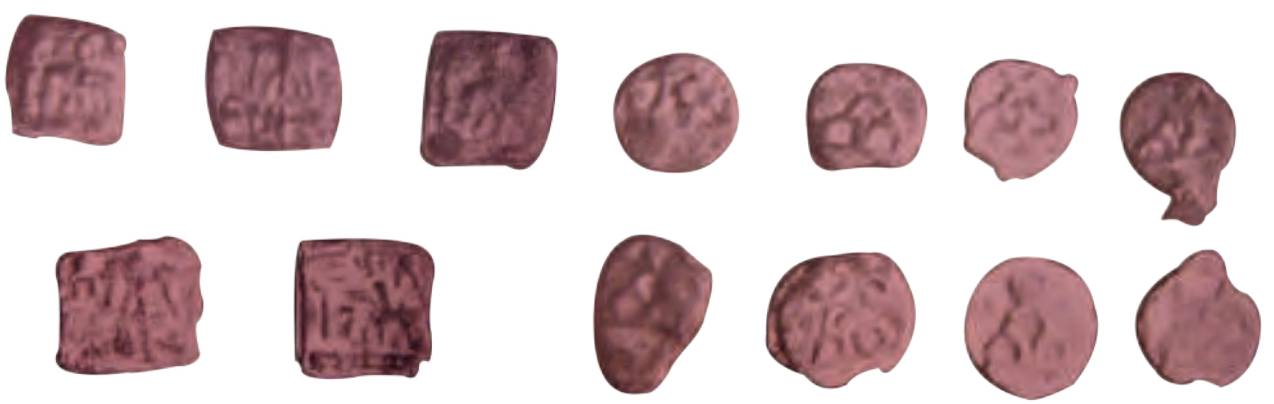

স্বস্তিকা, কুঁজওয়ালা ষাঁড়, হাতি, যুক্ত চিহ্ন ইত্যাদি। সংগ্রহে আছে কুষাণ রাজাদের বেশ কিছু তাম্রমুদ্রা। উল্লেখ করার মতো গুপ্তযুগের একটি স্বর্ণমুদ্রা, যেখানে খোদাই করা আছে কোনো রাজা এবং তাঁর সঙ্গী ছত্রধারীদের মূর্তি।

সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে পোড়ামাটি, মূল্যবান ও কিছু কম মূল্যবান নানান ধরনের শত শত মাল্যদানা। তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে শুরু করে শেষ মধ্যযুগ পর্যন্ত সময়কালের এই মাল্যদানাগুলি বিভিন্ন ধরনের নকশায় সমৃদ্ধ।

এই প্রত্নসম্পদ ছাড়াও এই সংগ্রহশালার অন্যতম সংগ্রহবস্তু হল পোড়ামাটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্প সংগ্রহ। পোড়ামাটি শিল্পের সুষমামণ্ডিত দ্রব্যসম্ভারগুলি (খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে ৬ষ্ঠ-৭ম শতক পর্যন্ত) বর্ণময় বর্ণনায় শিল্পী মাটির উপকরণকে অনায়াসে ব্যবহার করে আশ্চর্যরকমের দক্ষতার শীর্ষে অবগাহন করেছেন—মহাভারত, জাতকগাথা ইত্যাদি কাহিনির রূপকল্পনায়। শ্রেণিবৈষম্যের চিত্রও পরিষ্কার। কোথাও অলঙ্কার ভারগ্রস্তা রমণী ও দেবদেবীদের প্রাণময় মূর্তি, বৈচিত্রময় উগ্রপোশাক পরিহিতা দেবলোকের সুরসুন্দরীরা, কোথাও আবার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। তাই তমলুকের সংগ্রহশালার পোড়ামাটির (Terracotta) শিল্পসম্ভারগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়—ধর্মীয় এবং সমাজসম্পর্কীয়।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সম্পদ, উন্নতি এবং সৌন্দর্যের প্রতীক দেবীলক্ষ্মী। নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা, উন্নত বক্ষ, সরু কোমর আর ভারী পাছার এই মূর্তিটির হাঁটুর নিচের অংশ ভাঙা। দুটি হাত মেলে ধরা। শুঙ্গ যুগেরই আর একটি পোড়ামাটির ফলকে এক নারীমূর্তি দণ্ডায়মানা। দুই হাতে ধরা লম্বা ডাঁটা সহ প্রস্ফুটিত পদ্ম। বক্ষের নীচের থেকে কোমর পর্যন্ত ক্রমশই সরু, মাথায় অলঙ্কৃত কবরীবিন্যাস। ফলকের চতুর্দিকে বর্ডারে ফুলকারী নকশা। মনে করা হচ্ছে মূর্তিটি কমলালয় পদ্মাসনার। এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে শুঙ্গযুগ থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকে কুবেরের প্রতিমূর্তি। এমনই এক বেদিতে বসে থাকা কুবেরের মাথায় পাগড়ি, শরীরের নিম্নাংশে পোশাক, পরে আছে কানের দুল, হাতে বালা এবং গলায় লম্বা হার। ডানহাতে ধরে আছে কুবেরের অষ্টনিধির একটি। অষ্টম শতাব্দীর আর একটি ফলকে ওই একই রকম পোশাক ও অলঙ্কারে সজ্জিত কুবের ডানহাতে ধরে আছে একটি মাটির পাত্র এবং বামহাতে একটি বেজি। এছাড়াও মূর্তিটির কোমরবন্ধনীতে ঝুলে থাকা একটি ছুরি চিহ্নিত করে কুবেরকে দিকপাল হিসেবে। প্রায় একই ধরনের পোশাক এবং অঙ্গভূষণে সজ্জিত পোড়ামাটির ফলকে কিছু যক্ষ মূর্তি সমসাময়িককালের।

সংগ্রহশালার অন্যতম দৃষ্টিনন্দন নিদর্শনগুলি হল মৌর্য ও শুঙ্গ-কুষাণশৈলীতে রূপায়িত যৌবনগর্বিতা, অলঙ্কার ভারগ্রস্তা, আত্মসচেতনা 'পঞ্চচূড়া যক্ষিণী' মূর্তিগুলির যাদের মুখাবয়ব, কেশবিন্যাস আর মস্তকাভরণের বর্ণময় বর্ণনার অভিব্যক্তিতে স্থানীয় মা-মাটি-মানুষের শিল্পীদের এক নিজস্ব কুশলতা প্রতিফলিত। যক্ষিণীগুলির মাথার খোঁপায় পাঁচটি চূড়া বা আয়ুধ

বেদির ওপর সালংকারা দেবী (পোড়ামাটি);
আঃ খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতক

থাকলেও কিছু কিছু যক্ষিণীর কখনও দুটি বা দশটি আয়ুধ লক্ষ করা গেছে। পোড়ামাটির এই যক্ষিণী মূর্তিগুলির অনন্যকুন্তল-ভূষণ রূপ এবং মুখমণ্ডলের রহস্যময় হাসির ছটা চোখ টেনে নেবে দর্শককুলের। বৈচিত্রময় দাসী উগ্রপোশাকে সুরসুন্দরীরা যেমন ছিলেন সমাজে, তেমনই পাশাপাশি খেটে খাওয়া মা-মাটির সাধারণ মানুষ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি পোড়ামাটির ফলকে প্রতিভাত হয়েছে সারিবদ্ধভাবে তিনজন কৃষিজীবী মানুষের কাস্তে হাতে ফসল কাটার দৃশ্য। দুটি মানুষের অংশবিশেষ ভেঙে গেলেও স্বল্প কটিবাসে পূর্ণাবয়ব মানুষটির হাঁটু-ভেঙে বসে বাঁহাতে শস্যের মুষ্টি ধরে ডানহাতে কাস্তে নিয়ে কেটে নেওয়া স্মরণ করিয়ে দেয় ওই সময়ের নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের উপস্থিতির কথা। শুঙ্গ যুগের এমনই আর একটি ফলকে পুরুষ-সঙ্গীকে ডাইনে রেখে ‘খেত’-এ কর্মরত এক রমণী—আবরণহীন, আভরণহীন কোমরের নীচে একখণ্ড বস্ত্র পরিধান করে কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ করছেন। প্রায় একই সময়ের একই বর্ণনার অন্য একটি ভাঙা মৃৎফলকে রমণী অনুপস্থিত থাকলেও পুরুষ সঙ্গী ‘খেত’ থেকে মাথায় কিছু নিয়ে (সম্ভবত শস্য) ফিরে চলেছেন মাঠের মাঝারে ছোট্ট কুঁড়েঘরটির দিকে সামান্য একটু বিশ্রাম কিংবা কোনো কাজের অভিপ্রায়ে। সম্ভবত এটি একটি প্রাচীন কুঁড়েঘরের নমুনা।

ভগ্ন মৃৎফলকে খেতের বেড়ার ধারে কর্মরত দম্পতি : কুষাণ যুগ।

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বন্দরের আন্তর্জাতিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এই বন্দর থেকেই ভারতের বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল বহির্বিশ্বে। এই সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শৈলীর সেই কুঞ্চিত চুল, লম্বা কানের দুল, অর্ধ-উন্মিলিত চক্ষু, মাংসল চিবুক সম্মিলিত লাস্যময় বুদ্ধের পোড়ামাটির মস্তক, কিংবা একই রূপশৈলীর বর্ণনার ধ্যানী-বুদ্ধ অথবা ধর্মচক্রপ্রবর্তন ভঙ্গিমায় বুদ্ধ সংগ্রহশালার

ভগ্ন মৃৎফলকে খেতের বেড়ার একদিকে বাংলার প্রাচীন কুটির এবং অন্যদিকে দম্পতির পুরুষ : কুষাণ যুগ

মৃৎফলকে সারিবদ্ধভাবে খেতে ফসলকাটার দৃশ্যে কর্মরত কৃষকগণ : কুষাণ যুগ।

অপূর্ব কেশবিন্যাস, মাথায় মুকুট আর টায়রা (পারস্য প্রভাব) পরিহিতা সুন্দরী রমণীর মস্তক : কুষাণ যুগ

অনন্য সম্পদ। সেই সঙ্গে পাঞ্চ-মার্কড মুদ্রা (Coin) বোঝাই গরুর গাড়ি মূর্ত করে তোলে অনাথপিণ্ডদ জাতকের সেই বর্ণনা, যেখানে অনাথপিণ্ডদ বুদ্ধের জন্য জেতবন ক্রয় করতে চলেছেন। চৈনিক পরিব্রাজকের সেই ভালোবাসার ভালোলাগার বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান তাম্রলিপ্তকেই ফিরে পাওয়া যায় এইসব বৌদ্ধধর্মের প্রতীকী নিদর্শনগুলিতে, তাঁদের রেখে যাওয়া বর্ণনা প্রতিবিম্বিত হতে দেখে।

মাঝে মাঝেই বহু বহিরাগতের পদচিহ্ন পড়েছে পূর্বভারতের এই ব্যস্ততম বাণিজ্য কেন্দ্রটিতে—কখনও ভ্রমণার্থী, কখনও ব্যবসায়ী সার্থবাহ কখনও বা ধর্মীয় যাজকের ভূমিকায়। ফলে এই বাংলার মা-মাটি-মানুষের শিল্পীরা ওদের জীবনযাত্রায় প্রভাবান্বিত হয়ে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন নিজেদের শিল্প সৃষ্টিতে। এমনও হতে পারে বহিরাগত কিছু উৎসাহী শিল্পীর পদার্পণ ঘটে প্রভাবিত করেছে স্থানীয় শিল্পের রীতিনীতিকে—মিশ্রণ ঘটিয়েছেন নিজেদের চিন্তাকে এখানকার শিল্পকলার ক্ষেত্রে, উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন এক শিল্পরীতির। বিদেশিদের শার্টের মতো অন্তর্বাস, পায়জামা, উঁচু বুটজুতো, ফুলহাতা কোট, নিম্নাঙ্গের মোড়া পোশাক, ত্রিভুজাকৃতি টুপি ইত্যাদির প্রতিচ্ছবি যেন বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকে পাশ্চাত্য দেশের ছোঁয়ায় ভারতীর আস্বাদনের মাধুর্য। অনুভব করিয়ে দেয় মধ্য এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে তাম্রলিপ্তের যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কথা। একটি ভগ্ন পুরুষমূর্তির মাথায় শঙ্কু আকৃতির টুপির নিপুণ গঠন ভঙ্গিমা কিংবা একটি নারীমূর্তির পাশ্চাত্য রীতির কবরী বিন্যাস এবং শিরোভূষণের অনুপম সৌন্দর্য শিরোভূষণটিতে দেখা যাচ্ছে, এমনভাবে মাথায় রিবন দিয়ে সুদৃশ্য করে কেশবিন্যাস করা হয়েছে যেন তাজা ৫টি পদ্মপাপড়ির কুঁড়ি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে পশ্চিম এশীয় দেশ এবং ইরানের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুপ্তযুগীয় আরও একটি পোড়ামাটির ফলকে দেখা যাচ্ছে যে ঝোলানো বারান্দায় (?) এক প্রেমিক পেছন দিক থেকে তার প্রেমিকাকে সোহাগভরে জড়িয়ে ধরে উপহার দিচ্ছে একগুচ্ছ ফুল। মূর্তিটির বর্ণনাভঙ্গি আর গঠনশৈলীতে হেলেনীয় ছাপ সুস্পষ্ট। আর এই যুগেই তৈরি বর্ণনাময় এখানকার এক মৃৎকলসের গায়ে খোদাই করা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি থেকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তাম্রলিপ্তের যোগাযোগ স্পষ্ট। তাম্রলিপ্তের সমুদ্রনৈকট্যের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেছিল পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলির সঙ্গে। ঘটেছিল বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান। তমলুক সংগ্রহশালার অসংখ্য মূল্যবান প্রত্নসম্পদ সেই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের স্মৃতিকে বুকে ধরে রেখেছে। তাই এই অনন্য প্রত্নরাজির নিরিখে বলা যায় 'বিস্মৃত যুগ-পরম্পরার তথ্যাদিসমূহের প্রেক্ষাপটে অনুভূত হয় একদা তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচ্য ভারতীয় সভ্যতার এক অনন্য প্রাঙ্গণ এবং শত উর্মিমালা সমন্বিত সমুদ্রপথের অদূরে প্রসারিত ক্লান্ত নাবিকের লক্ষ্যস্থল ও নয়নাভিরাম আশ্রয়-ভূমি।'

এরই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত ২০টির মতো পাথরের মূর্তি ভাস্কর্য। অন্যতম

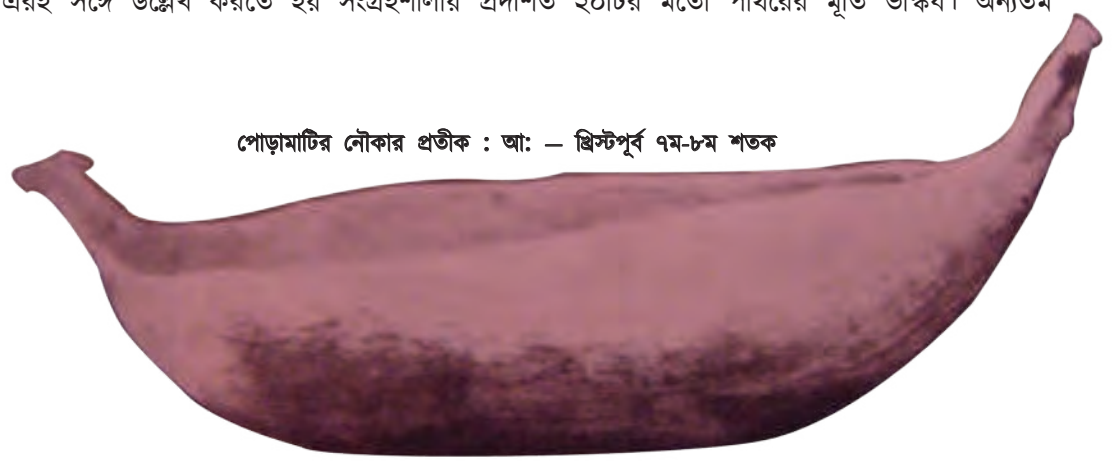

পোড়ামাটির নৌকার প্রতীক : আ: — খ্রিস্টপূর্ব ৭ম-৮ম শতক

পালযুগের দণ্ডায়মান বিষ্ণুর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি এবং দণ্ডায়মান চামুণ্ডার এক ক্ষত-বিক্ষত মূর্তি। বেলেপাথরের পরবর্তী সময়ের ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধের একটি মূর্তি। মাটির গন্ধে ভরা বহুদিন চলতে থাকা সাধারণ মানুষের কলাকৃতি ১৬৪টি বহুবর্ণ রঙিন চিত্রিত পট। গল্প বলার ঢং-এ পৌরাণিক, মহাকাব্যিক, কিংবদন্তীর কাহিনি এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে গুটানো কাগজে নানা রঙে চিত্রিত করে পৌঁছে দেওয়ার কাজে এই পটচিত্রের জুড়ি মেলা ভার। পুরানো দিনের হাতে তৈরি কাগজ এবং তালপাতার ওপরে লেখা বেশ কিছু পুঁথি সংগৃহীত আছে এই সংগ্রহশালায়। পুঁথিগুলি লেখা হয়েছে মূলত সংস্কৃত সম-বাংলা এবং বাংলা ভাষায়।

পরিশেষে তমলুকের এই সংগ্রহশালার রাখা প্রত্নবস্তুগুলি ছাড়াও আর একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কারে পাওয়া অনন্য প্রত্নসম্পদ ভারতীয় উপমহাদেশে একক স্থানীয় আদিম মানুষদের তৈরি বিস্ময়কর প্রত্নসম্ভারের উল্লেখ না করলে এই এলাকায় প্রাপ্ত প্রত্নরাজি নিয়ে লেখা অসম্পূর্ণ থাকে। এই রূপনারায়ণ নদের তীরেই তমলুকের অদূরে এই নদ যেখানে হুগলি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তার একটু আগে নদের পশ্চিম তীরে নাটশাল গ্রামে (জে.এল.নং ১৫৭) আবিষ্কার হয়েছে মহামূল্যবান এই প্রত্নসম্পদ। নাটশালের এই আশ্চর্যজনক প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তাম্রলিপ্তির কৃষি সভ্যতার বহু আগের, আজ থেকে প্রায় ১০-১৫ হাজার বছরের বেশি সময়ের আগের অরণ্যচারী, মৎস্য শিকারজীবী মানুষের তৈরি এক উজ্জ্বল সভ্যতার লগ্নে—নব্যপ্রস্তর যুগের ঠিক আগের আদিম কৃষিসভ্যতার সূচনালগ্নের আগে বা তারও আগের পুরাতন প্রস্তর যুগের শেষ লগ্নে প্রাগৈতিহাসিক

রূপনারায়ণ নদের তীরে তমলুকের নাটশাল প্রত্নবস্তু আবিষ্কারক প্রশান্তকুমার মণ্ডল ছোটদের সঙ্গে

সভ্যতায় ভারতীয় প্রত্ন-ইতিহাসের এক অজ্ঞাত ও রহস্যময় প্রান্তরে আমাদের টেনে নিয়ে গেছেন তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রের কিউরেটর প্রশান্তকুমার মণ্ডল।

প্রয়াত সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানী ড. তারাশিস মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে এবং তিন সঙ্গী আশুতোষ মাইতি, গোকুলচন্দ্র ঘোড়ই ও রঞ্জিতকুমার মুদলীদের নিয়ে ১৯৮২-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৩-র ফেব্রুয়ারি সময়সীমায় নাটশাল থেকে অসংখ্য পুরানো হাড়ের স্তূপ নিয়ে এসেছিলেন নিজের বাড়িতে। দিনের পর দিন সেগুলির পরিচর্যা-পরিষ্কার করেছেন অসীম ধৈর্য এবং গভীর মমতায়। সময় লেগেছে কয়েক বছর। আবিষ্কারের কথা এবং প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য জানিয়েছিলেন ১৯৮৪-র ১৫ই ফেব্রুয়ারির দি টেলিগ্রাফ পত্রিকায়। শ্রীমণ্ডল নাটশাল-এর এই প্রত্নস্থল থেকে পেয়েছেন মানবদেহের জীবাশ্ম (mandibles), উরুর অস্থি (femur) এবং কণ্ঠের অস্থি (collarbone or clevicle)। শিলীভূত হাড় (fossilised bone), দাঁত ও হরিণ শিং (antler) দিয়ে তৈরি হরেক রকমের ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র এবং নানাবিধ প্রসাধনসামগ্রী। শিলীভূত হাড় এবং হরিণ শিং-এর উপর মা-মাটি-মানুষের তৈরি নানান অনুপম শিল্পকর্ম—ভাস্কর্য (carving), খোদাই-এর কাজ (engraving), চিত্রাঙ্কন (painting) ও হাড়ের ওপর কাদার কাজ (Clay modelling)। এগুলির সঙ্গে পেয়েছেন এই সমস্ত জিনিসপত্র তৈরি করার নানান যন্ত্রপাতি—বাটালি (blade), চাঁছার যন্ত্র (serapper), চামড়া গর্ত করার জন্য ছেদক (perforator) ইত্যাদি। কখনো কখনো সরাসরি হাড়ের ওপরই ওই সমস্ত শিল্পকর্ম আবার কখনো বা হাড়ের ওপর কাদার প্রলেপ দিয়ে তার ওপর ওইসব শিল্পকর্ম। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের মুখ খুবই ছোট্ট আকারের। বহুদিনের স্তূপীকৃত হাড়ের ভাণ্ডার থেকে সম্প্রতি চিহ্নিত করেছেন শিলীভূত হাড়ের চ্যাপ্টা চৌকানো একটি অংশের যেখানে বিম্বিত হয়েছে পুরো একটি গ্রামের দৃশ্যপট—এর রাস্তাঘাট, তাদের ঘরবাড়ি এবং একটি মানুষকে বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর গ্রামেরই বহু মানুষের মিলিত প্রচেষ্টা। এমনই ছোট একটি হাড়ের ওপর কাদার প্রলেপের পর ভাস্কর্য করা হয়েছে ত্রিকোণাকৃতি টুপি পরা মানুষের এক মুখ (৪.৮ × ১.৯ সেমি)। টুপির নিচে প্রতিভাত হয়েছে ভুরু, চোখ, নাক, মুখ এবং চিবুক। এর থেকে বড় আর একটি হাড়ের (৬.৫ × ২.৪ সেমি) একদিকে কাদার প্রলেপের ওপর মাথায় ফেট্টি সহ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে থাকা বাঁদিকে তাকিয়ে এক মানবী মুখ। একই হাড়ের পেছনের দিকে দণ্ডায়মানা অশরীরী আধিভৌতিক বাঁদিকে তাকিয়ে থাকা আর এক মানবীর পূর্ণমূর্তি। মুখমণ্ডল হাড়ের ওপর সরাসরি খোদাই হলেও নিচের দিকে ঝুলে থাকা হাতগুলি কাদার প্রলেপের ওপর তৈরি। আরও একটি গোলাকার চ্যাপটা হাড়ের (ডায়ামিটার—৫.৮ সেমি) পোড়া লাল রঙের নানাবিধ চিত্রাঙ্কনের কাজ। এখনও পর্যন্ত এই ধরনের শিল্পকর্মের নমুনা ভারতবর্ষে বা ভারতীয় উপমহাদেশে কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। ১৯৯৩-তে অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রশান্ত মণ্ডলের আবিষ্কার সম্পর্কে বললেন, “The assemblage of the object of art is indeed one of the most remarkable archaeological finds in the whole of Indian sub-continent.” ঐতিহাসিক অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় প্রায় একই সুরে বলেছিলেন, “These rare attribute entitled the finds to be regarded as objects of rare value and elegance among the archaeological discoveries in the entire area of the

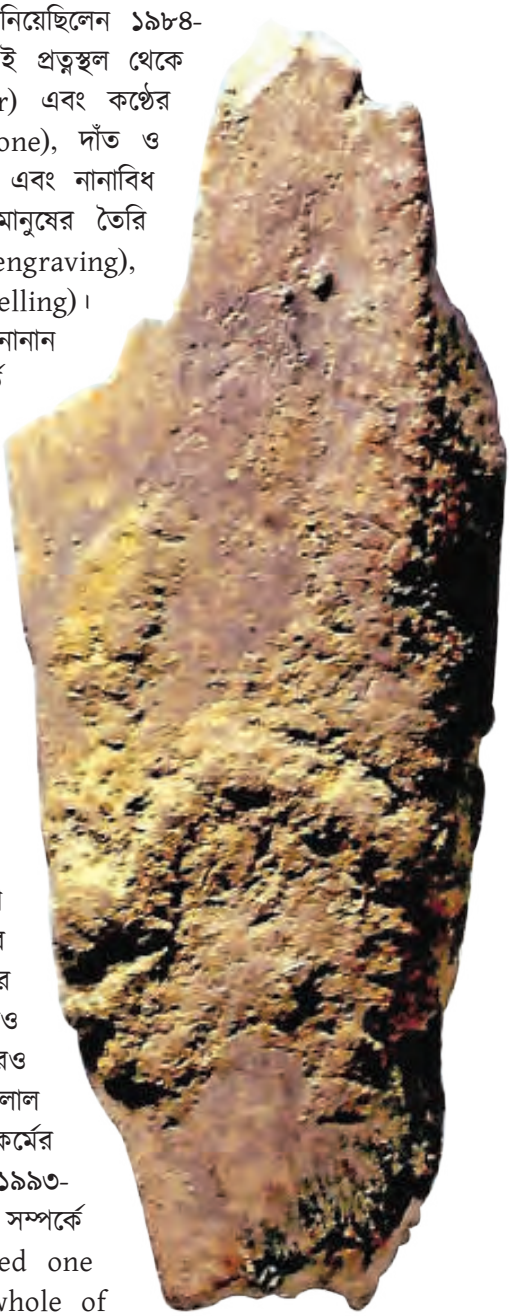

শিলীভূত হাড়ে কাদার প্রলেপের উপর ত্রিভুজাকৃতি টুপি পরিহিত পুরুষ মানুষের মুখ : ৫০০০-এরও বেশি বছরের পুরানো (৪.৮ × ১.৯ সেমি)

Indian sub-continent." এমনকি ভারত ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক পর্বের প্রাজ্ঞ পুরুষ এইচ. ডি. সাংকালিয়া যিনি এই শিল্পকর্মগুলির অনুসন্ধানে সারা ভারত ঢুঁড়ে ফেলে খুঁজে না পেয়ে একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, এই ধরনের শিল্পকর্মগুলিকে এবং তার স্রষ্টাদের নদী তীরবর্তী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আর কোনো দিন পাওয়া যাবে না, সেই তিনি শ্রী মণ্ডলকে তাঁর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্য পত্রালাপে (১৯শে অক্টোবর ১৯৮৩) বললেন, "... your discovery is most interesting and I think, it will provide a most interesting and valuable insight into the continuing art tradition's of the Bengalees." সাংকালিয়ার অসম্ভবের সীমারেখায় দাঁড়িয়েই শ্রী মণ্ডলের এই অসাধারণ আবিষ্কার।

এই শিল্পকর্মগুলি তাম্রলিপ্তির সমসাময়িককালের মানুষের উপস্থিতিকেই প্রতিভাত করে তোলে। সমুদ্র-সান্নিধ্য প্রাক্ দ্রাবিড় যুগের সেই সব মানুষই গড়ে তুলেছিলেন এই সভ্যতা। ড. পশুপতি মাহাতো এই সভ্যতাকে বলেছেন, হড়মিতান সভ্যতা। পরবর্তী পর্যায়ে দ্রাবিড় মানুষদের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে প্রাক্-দ্রাবিড় মানুষেরা শিকার জীবন এবং কৃষিজীবনের বৃত্তের বাইরে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ আর রাষ্ট্র পরিচালনায় ঝুঁকেছিলেন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত তাম্রলিপ্তের সভ্যতার বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল এই সব মানুষদের (প্রাক্-দ্রাবিড় ও দ্রাবিড়)। এই সভ্যতার চিহ্ন বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে বাহক সংখ্যাধিক্য মাহিষ্য জাতির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই বিদ্যমান। এই 'আসুর' সভ্যতার কারণেই হরপ্পা, ব্যাবিলন, মিশর ও সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় ছিল তাম্রলিপ্তর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'বঙ্গ দেশে দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) তাদের একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর ছিল। নাটশাল গ্রামের এই শিল্পকর্মগুলিকে প্রত্যক্ষ করে সেই সব শিল্পীদের কথাই মনে আসে। এবং এই শিল্পকর্মগুলিকে দেখে বলা যায় এখন প্রস্তর যুগ মোড় নিয়েছে সভ্যতার বর্ণাঢ্য প্রান্তরে, শিল্প ও মানসিকতার নতুন ভুবনের অভিমুখে। অতীতের উদাসী হাওয়ায় সংস্কৃতির প্রবহন উপনীত হয়েছে যুগপ্রবাহের আশ্চর্য এক তীরে। তাই তমলুক সংগ্রহশালার প্রত্নসম্পদ এবং শ্রী মণ্ডলের আবিষ্কারের প্রত্নবস্তুগুলি মিলিয়ে খুঁজে পাওয়া গেছে ভারতের 'বিস্মৃত সেই প্রহরের আদিম মানুষের জীবন সংগ্রামের রূপরেখা, তার বিবর্তনের চারণগান এবং উত্তরণশীল চেতনার সাক্ষ্য, নবীন সংস্কৃতির উপাখ্যান।'

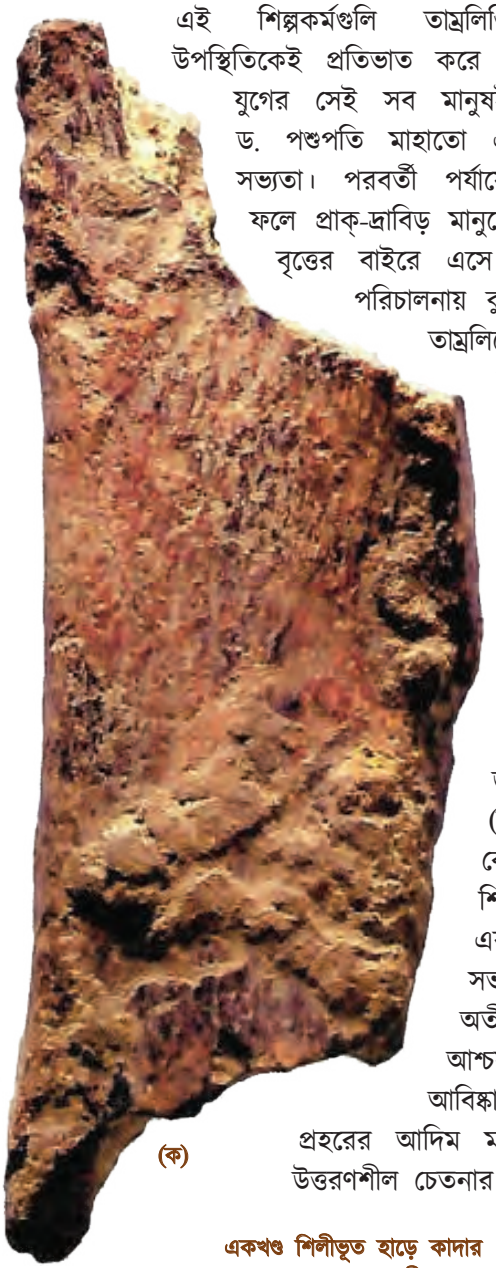

(ক)

(খ)

একখণ্ড শিলীভূত হাড়ে কাদার প্রলেপে একদিকে (ক) এক মহিলার বিকৃত মুখের হাসি এবং অন্যদিকে (খ) এক ভূতুড়ে মানবীর দণ্ডায়মানা মূর্তি ভাস্কর্য : ৫০০০-এরও বেশি বছরের পুরানো (৬.৫ × ২.৪ সেমি)

ছবি সৌজন্য : লেখক

বাংলা মঙ্গলকাব্যে ইসলামি প্রসঙ্গ: ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’

ড. রজতকিশোর দে

দিল্লির সিংহাসনে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছ-জন মোঘল সম্রাট সিংহাসনে বসেছেন। মোঘল তখত নিয়ে শাহাজাদা ও আমির ওমরাহের মধ্যে যে তীব্র লড়াই সেই অন্তর্কলহের ফাঁকে শ্বেত বণিকের দল দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তারের নামে অর্থনৈতিক শোষণের ফন্দি আঁটতে লাগল। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবসান আর সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব প্রবলভাবে লক্ষ করা গেল। এই সুযোগে শ্বেত বণিকের দল বিভিন্নভাবে ভারতবর্ষের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা চালাল। ফলে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো অনুযায়ী স্পষ্টত অর্থবান বুদ্ধিজীবী নাগরিক এবং গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষিজীবী জনতা এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হল। এছাড়া জাতিগত বৈষম্য সৃষ্টি হল। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করল। পরাজিত মুসলিম সম্রাট তথা জাতির পায়ের তলার মাটি চিরতরে সরানোর জন্য হিন্দুদের নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে কব্জাগত করল। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ আমলে হিন্দুরা অনেক উঁচু পদ বা জমিদারি ভোগ করেছে।

ঔরঙ্গজেব

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর কিছুকাল আগে থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় দিল্লির প্রতিনিধি হিসেবে চারজন সুবেদারের আগমন ঘটেছে। এরা হলেন মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন, আলিবর্দি খাঁ এবং সিরাজদ্দৌলা। এই সময়টি নবাবি আমল নামে পরিচিত।

মুর্শিদকুলি খাঁর সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থায় ঔরঙ্গজেব মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতা, কর্মদক্ষতা, সূক্ষ্মসংস্কৃতি বোধ ও জ্ঞানচর্চার পারদর্শিতায়। নতুনদিকের উন্মোচন ঘটিয়ে বাংলাদেশের হিন্দুসমাজের একটা পরিবর্তন আনলেন তিনি। এতকাল আগ্রা ও পাঞ্জাব থেকে লোক এনে সৈন্যদলে ভর্তি করানো হত; এবার থেকে হিন্দু জনগণ কর্মদক্ষতার ওপর ভিত্তি করে উঁচু পদ পেতে লাগল। রাজস্ব ও হিসাব নিকাশের জন্য দক্ষ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ভীষণ কঠোর ছিলেন। ‘তারিখ-ই-বাঙ্গালা’ থেকে জানা যায় প্রতিবছর বাড়তি টাকা রাখার জন্য সিন্দুক তৈরি করা হত। এর ফলে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষই বিপর্যস্ত হত।

মুর্শিদকুলি খাঁ

১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি বেশি দিন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি; তার কারণ একদিকে যেমন পরিবার, শাসনবিভাগ বা স্থানীয় জমিদার ছিল তেমনি অন্যদিকে তিনি বিলাসব্যসনে অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলেন। চরিত্রগত ত্রুটিই পদচ্যুত করতে সাহায্য করেছিল তাঁকে।

১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খান সিংহাসনে বসেন। তিনি সিংহাসনে বসার উপযুক্তপ্রার্থী ছিলেন না। অধিকাংশ সময় হারেমে কাটানোর জন্য শাসনক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং সেই সুযোগে আমির-ওমরাহরা যথা আলিবর্দি এবং হাজি আহমেদ ষড়যন্ত্র শুরু করেন। কৌশলে হাজি আহমেদ নবাবকে স্তোকবাক্য দিয়ে মুর্শিদাবাদে রেখে দিলে আলিবর্দি পাটনা থেকে সৈন্য নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। অবশেষে হাজি আহমেদ সপরিবারে আলিবর্দির সঙ্গে যোগ দেন। ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে ১০ এপ্রিল যুদ্ধে সরফরাজের মৃত্যু হলে আলিবর্দি সিংহাসনে বসেন, মৃত পরিবারবর্গকে সহৃদয়তা দেখিয়ে কব্জায় আনলেন, আবার অন্যদিকে দিল্লির বাদশাহদের সন্তুষ্ট করে বাদশাহ সনদ লাভ করেন।

সুজাউদ্দিন

আলিবর্দি সুদক্ষশাসক হওয়া সত্ত্বেও শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। নবাব সুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তমজঙ্গ ওড়িশার নায়েব নাজিম ছিলেন। তিনি কটক থেকে সৈন্য নিয়ে বাংলা আক্রমণ করলেন, কিন্তু রুস্তমজঙ্গ পরাজিত হলেন। আলিবর্দি ভ্রাতুষ্পুত্রকে ওড়িশার নায়েব করে ফিরলেও তার অযোগ্যতা ও দুর্ব্যবহারে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হল। রুস্তমজঙ্গ আবার আক্রমণ করলেন। ফলে নতুন নায়েব বন্দী হলেন। আলিবর্দি এই সংবাদ পেয়ে পুনরায় ওড়িশায় গেলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্ধার করলেন। ওড়িশা থেকে মুর্শিদাবাদে ফেরার পথে আলিবর্দি খবর পান ভোঁসলেরাজের মারাঠা সৈন্য বাংলা আক্রমণে উদ্যত হয়েছে। এই বর্গিরা বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অত্যাচার ও লুটতরাজ চালিয়ে, নবাবের কাছ থেকে বলপূর্বক রাজস্ব আদায় (চৌথ) করে দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করল। চুক্তিপত্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও বারবার আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশে একটা শিহরন জাগানো পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। এই বর্গি আক্রমণের ইতিহাস গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' এবং বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের বিবরণে বিবৃত আছে। কোনো উপায় না পেয়ে আলিবর্দি ছলনার আশ্রয় নেন। ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁর অনুচরদের লোভ দেখিয়ে শিবিরে এনে হত্যা করেন। মারাঠা অত্যাচার থেকে দেশ রক্ষা পেলেও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ল। অর্থের জন্য আলিবর্দি জমিদার, ইংরেজ ও ফরাসি বণিকদের ওপর জুলুম শুরু করলেন। আলিবর্দি পুরী, ভুবনেশ্বর মন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন। এই প্রতিশোধের জন্যেই হয়তো বর্গিরা বার বার আক্রমণ করেছে। এমন অনুমান অমূলক নয়। একে অনেকে হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব হিসেবে চিহ্নিত করলেও, তখনকার দিনে মন্দির বা মসজিদে অনেক দামি দামি জিনিস ও টাকা সঞ্চিত থাকত। সেই কারণেই হয়তো আলিবর্দি একাজ করেছিলেন—এমন অনুমান উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্য দিকে গ্রাম্য জমিদারশ্রেণি মুসলিম অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য রাস্তা খুঁজছিল। ফলে গ্রামনির্ভর বাঙালির মনে বর্গির আক্রমণের বিষয়টি রাষ্ট্রশক্তি পরিবর্তনের আশা জুগিয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম খণ্ডে বর্গি আক্রমণের যে সুফলের কথা আছে তা থেকে বোঝা যায় যে জমিদারশ্রেণির মানসিক 'রিলিফের' জন্য লেখা। আর গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' এবং রামপ্রসাদের ব্যাকুল আর্তিমূলক ভক্তিগীতিতে যে কথা পাই তা থেকে বাংলাদেশের দৈনন্দিন চিত্র যেন ফুটে উঠেছে।

নবাব আলিবর্দি খাঁ

বৃদ্ধ আলিবর্দি বার বার যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অন্যদিকে দৌহিত্র, জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে নবাবের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল এবং মনের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় ইংরাজ বণিকেরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অবাধে লাভজনক বাণিজ্য করতে লাগল। আসন্ন বিপদের পটভূমিকায় আলিবর্দির মৃত্যু হল।

সিরাজদৌল্লা

পুত্রহীন আলিবর্দির মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে বসেন। পরবর্তী ঘটনায় ইংরেজ বণিকেরা নানা ছলনার আশ্রয়ে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছে। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার ঘরে ও বাইরে শত্রু সৃষ্টি করে নবাবকে বিপর্যস্ত করেছে। মিরজাফরকে হাতের পুতুলে পরিণত করে ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছিটিয়ে পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসে কলঙ্কময় অধ্যায়। এরপর ব্রিটিশ সরকার দীর্ঘদিন শাসনকার্য চালিয়েছে।

তাহলে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গেল ভারতচন্দ্র যে-সময়ে কাব্যরচনা করেছেন সেই সময়ে দিল্লি ও বাংলার উভয় সিংহাসনেই মুসলিম শাসক শাসন করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র ছিলেন হিন্দুরাজার রাজসভার সভাকবি। সেক্ষেত্রে কেন তিনি কাব্যমধ্যে ইসলামি প্রসঙ্গ আনলেন এবং তার প্রয়োজনীয়তা ছিল কতখানি তা দেখা দরকার; সেই সঙ্গে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বিশেষত 'মানসিংহ' অংশে ইতিহাসকে টানবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে কতখানি সফল হয়েছেন তাও দেখা যেতে পারে।

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথমখণ্ডের 'গ্রন্থসূচনা' অংশে এবং 'কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন' অংশে ইসলামি প্রসঙ্গ আছে। দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে প্রতাপাদিত্য বাংলার কায়স্থবংশীয় মহাপ্রতাপশালী রাজা সেজন্য কোনো বাদশাকে ভয় করে না। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে মানসিংহ বাংলায় এসেছেন প্রতাপাদিত্যকে যথোচিত শাস্তি দিতে। প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের বিরোধের কাহিনির মধ্যে ইসলামি প্রসঙ্গ আছে। তৃতীয় খণ্ড 'মানসিংহ' অংশে মোটামুটি পুরো অংশ জুড়েই ইসলামি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। প্রথমত কেন তিনি ইসলামি প্রসঙ্গ আনলেন তার কারণগুলি সূত্রাকারে দেখানো যেতে পারে—

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরের সঙ্গে দেখা করেছেন রবার্ট ক্লাইভ। শিল্পী: ফ্রান্সিস হেম্যান
(সৌজন্য: ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারি লন্ডন)

(১) ভারতচন্দ্রকে রাজসভার কবি হিসাবে রাজা বা অমাত্যদের মনোরঞ্জন করে চলতে হত। ভারতচন্দ্রের জীবনীতে দেখি নানা দুঃখ-কষ্ট-উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। জীবনে ভালবাসা বা সহানুভূতি যেমন পাননি, সেজন্য রাজসভায় ঠাঁই পাওয়ায় সেই রাজার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সেক্ষেত্রে হিন্দুরাজা কোনো কারণে মুসলমান সম্রাটের কাছে যদি দায়বদ্ধ থাকেন এবং কোনো বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ফলস্বরূপ মুসলিম সম্রাটকে দায়ী করে রাজসভার কবিকে কাব্য রচনা করতে আদেশ দেন, তাহলে কবির মনের ছাপ কাব্যখানিতে কতখানি আছে বা সামাজিক পরিস্থিতি কতখানি সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। এক্ষেত্রে ইসলামি প্রসঙ্গের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না।

(২) ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শেষ কবি এবং বলা হয় যুগসন্ধির কবি। তাই নতুনকে ধরবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে আছে। এতদিনের প্রচলিত মঙ্গলকাব্যে দেবচরিত্রের প্রাধান্য দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এ কাব্যে দেবতাকে মানব করে নেওয়ার একটা বিষয় আছে। আর সেক্ষেত্রে এই কাব্যে ইসলামি প্রসঙ্গের যে-সব বিষয়গুলি আছে সেগুলি দেবতাকে মানবীকরণ করার জন্য প্রভূত সাহায্য করেছে।

(৩) ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য অনুসরণে 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের দেওয়া তথ্য থেকে জানতে পারি, "ভারত বলিলেন 'মহারাজ'! কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।" রাজা কহিলেন "মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (যিনি কবিকঙ্কন নামে খ্যাত ছিলেন,) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় 'চণ্ডী' রচিয়াছিলেন, তুমি সে পদ্ধতিক্রমে 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক প্রস্তুত কর। সে আজ্ঞা পালনপূর্বক কবিকেশরী অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।"১ এই তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, ভারতচন্দ্র তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও কিছু পরিমাণ করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুকুন্দ যেমন 'নগরপত্তন' এবং আত্মবিবরণী অংশে ইসলামি প্রসঙ্গ এনেছেন ভারতচন্দ্রও তেমনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা এবং মানসিংহের কাহিনিতে বিস্তৃত ইসলামী প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

রাজা মানসিংহ

(৪) বিধর্মী দিয়ে মঙ্গলদেবীর পূজাপ্রচারের বিষয়টি মঙ্গলকাব্যের একটি সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সাধারণ 'প্যাটার্ন'টি মনসামঙ্গলের ক্ষেত্রেও লক্ষ করতে পেরেছি। এক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র যেন তারই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নবায়ন ঘটালেন।

(৫) অন্নদামঙ্গলের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের সংযোগ ক্ষীণ নয়। প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনিটি ঢুকে পড়ায় বিষয়টির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ইসলামি প্রসঙ্গটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে সেতুবন্ধনস্বরূপ কাজ করেছে। মানসিংহ বর্ধমানে কিছু দিন বাস করেছেন দ্বিতীয় খণ্ডে আর তৃতীয় খণ্ডটিতে মানসিংহের বর্ধমান থেকে প্রস্থানের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে। প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে ইসলামি প্রসঙ্গটি যোগসূত্র রচনা করেছে বলা যেতে পারে।

(৬) অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা মঙ্গলকাব্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। দিল্লীশ্বর ভবানন্দকে কয়েদ করলে যেখানে ডাকিনী-যোগিনী, ভূত-প্রেত, রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য যে বিষয় তা মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধের বিষয়কে অবলম্বন করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের ধর্মকে, সর্বোপরি নিজেকে বড়ো করে তুলতে চায়। ভবানন্দ মজুমদারের মানসিংহকে সাহায্যের মধ্যে দিয়ে কবি এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন বলে মনে হয়।

কারণ মানসিংহ ছিলেন জাহাঙ্গীরের লোক আর ভবানন্দ দেবী অন্নদার পরমভক্ত। পরমভক্ত অর্থাৎ ধার্মিক যিনি হবেন তিনি দেশ-কাল-জাতি সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে বিপদে পড়া মানুষকে উদ্ধার করবেন এবং সেইগুণের দ্বারাই মানুষ আকৃষ্ট হয়ে উপকারি মানুষটিকে অনুসরণ ও তার ধর্মকে সম্মান দেবেন। এখানে এই বিষয়টিই ঘটেছে, ভবানন্দ নিঃস্বার্থভাবে মানসিংহকে সাহায্য করেছে আর তাই মানসিংহ নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভবানন্দকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেননি। এখানে কবি তাঁর মনের সুপ্ত বাসনা যেন ভবানন্দ ও মানসিংহের সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পূরণ করেছেন।

প্রতাপাদিত্য

এখন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কবি ভারতচন্দ্র ইতিহাসকে কতখানি গ্রহণ করেছেন দেখা যাক। অন্নদামঙ্গলের তিনটি খণ্ড (ক) অন্নদামঙ্গল (খ) কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর এবং (গ) অন্নপূর্ণামঙ্গল বা মানসিংহ।

'অন্নদামঙ্গল' অংশে কবির কিছুটা ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস আছে। বাংলায় তখন আলিবর্দির শাসনকাল। মোঘল সেনাবাহিনীর সহায়তায় আলিবর্দি ভুবনেশ্বর আক্রমণ করে মন্দির ও দেবস্থান ধ্বংস করলে ক্রুদ্ধ মহাদেবের স্বপ্নাদেশের ফলে বর্গিয় রাজা ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠাল বাংলা ধ্বংস করে অত্যাচারী মুসলমানকে যথোচিত শাস্তি দিতে। বর্গির আক্রমণে আলিবর্দি বিপাকে পড়লেন এবং রাজকোষ শূন্যতে পরিণত হল। অত্যাচারী নবাব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বারো লক্ষ টাকা নজরানা চেয়ে বসলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তা দিতে না পারায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হল। কৃষ্ণচন্দ্র দেবী অন্নদাকে স্তবে তুষ্ট করে বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন। সভাকবিকে সেইমতো আদেশ দিলেন দেবীমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্য লিখতে। এরই ফল হল ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'।

দ্বিতীয়খণ্ড মানসিংহ অংশে যে ইসলামি প্রসঙ্গ আছে তা থেকে বোঝা যায় কবির মনোভাব হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ছিল। তৃতীয় খণ্ডের যে ঐতিহাসিক কাহিনি কবি লিখেছেন, সেখানে ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্য তো পাওয়া যায়ই না, বরং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে কল্পনার আধিক্য ও সেই সঙ্গে রাজাদেশ মিলে একটা জগাখিচুড়িমার্কা আখ্যান তৈরি হয়েছে। আসলে কবির উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন নয়, বরং মহারাজের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের মাহাত্ম্য প্রচারই প্রধান উদ্দেশ্য।

সর্বোপরি মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যে যুদ্ধকথা আছে তা ইতিহাসনির্ভর নয়। ভারতচন্দ্রের এ বিষয়ে মূল আশ্রয়স্থল ছিল জনশ্রুতি এবং 'ক্ষিতীশবংশাবলী' গ্রন্থ। "ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালে নবদ্বীপ রাজবংশ সম্পর্কে যে সকল জনশ্রুতি এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহাদের সমস্তই তিনি তাঁহার কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যেমন তাঁহার নিজেরও লক্ষ্য ছিল না,

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির প্রধান ফটক

তেমনি তৎকালীন সমাজে তাহার জন্য অন্য কাহারও দাবীও ছিল না। তথ্যপরিবেশন পরিবর্তে মহিমাকীর্তনই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে তাহা আশাও করা যাইতে পারে না।"২

ইতিহাসের তথ্য থেকে জানা যায়—

(ক) মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কোনো যুদ্ধ হয়নি।

(খ) মানসিংহের বাগোয়ান যাওয়া সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

(গ) ভবানন্দ যে মানসিংহের কাছে জমিদারি পেয়েছিলেন, এমন তথ্যও ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

তাহলে দুটি ইসলামি প্রসঙ্গ (১ম ও ৩য় খণ্ড) থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়। কোনো ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসের নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে কাব্য রচনা করেননি। এর কারণ অবশ্য অন্য। তিনি রাজসভাশ্রিত কবি। যেহেতু তিনি মাসমাইনের দ্বারা নিয়োজিত সেজন্য রাজার আদেশ তাঁকে মেনে চলতে হত। এছাড়া তিনি মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। যে ক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্যের সাধারণ ফর্মটি বজায় রেখে চলতে হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের একটা সাধারণ রীতিই হল বিধর্মীকে দিয়ে পূজাপ্রচার। তবে এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার সপক্ষে কখনোই মত দেননি। তার পরিচয় রয়েছে ব্যাস প্রসঙ্গে (বিষয়টি ইসলামি প্রসঙ্গের বাইরে)। সেকালে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে যে গোঁড়ামি ছিল সেগুলি তির্যক ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন।

"দেখ দেখ অহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হৈল গোঁড়া শৈব॥"

এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন—"অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই প্রথম ধর্মবিষয়ক গোঁড়ামি সামাজিক ব্যঙ্গের কারণ হইয়াছিল, পরবর্তী শতাব্দীতে এই মনোভাবের পূর্ণতর বিকাশ দেখা দিয়াছিল। উদ্ধৃত অংশে ধর্মসমন্বয় প্রচার অপেক্ষা ধর্মাচারণের গোঁড়ামিকেই অধিকতর ব্যঙ্গ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কারণ, ভারতচন্দ্রের বুদ্ধিবাদী মন ধর্মবিষয়ক যে ধারণাই পোষণ করুক না কেন, সে যুগের ধর্মবিষয়ে গোঁড়ামি যে সহ্য করিতে পারে নাই, ব্যাসের প্রসঙ্গ তাহারই নিদর্শন।

কিরীটিশ্বরী মন্দির

ভারতচন্দ্রের ধর্মসমন্বয়ের কথা তাঁহার নিজস্ব ধর্মবিষয়ক কোনও মনোভাব হইতে যে আসিয়াছে, তাহা মনে করিতে পারা যায় না, বরং তাঁহার কাব্য যুগপ্রভাববশত আসিয়াছে। মুসলমান আক্রমণের পর হইতেই ধর্মসমন্বয়ের একটি সমস্যা এই জাতির মনে নানাভাবে উদয় হইয়াছে, ভারতচন্দ্রের পূর্বেই সমাজে উহার একটি সুস্পষ্ট রূপও প্রকাশ পাইয়াছিল। সত্যপীরের পরিকল্পনায় দুইটি বিপরীতমুখী সমন্বয় সাধকের প্রয়াস দেখা যায়।"৩

কিরীটিশ্বরী—বাংলার অন্যতম সতীপীঠ

মীরজাফর

পৃষ্ঠপোষকের মন রাখতে গিয়ে বাংলার বীর প্রতাপাদিত্যকে ছোটো করেছেন। তাঁকে খাঁচায় বন্দী করা এবং তাঁর করুণ মৃত্যুকে কবি নিজের লেখায় চিত্রিত করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি। আসলে যাকে আধুনিককালে স্বদেশপ্রেম বলে তা ইংরেজ শাসনের পূর্বে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ছিল না। কারণ প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করে যেখানে বাংলা উপন্যাস বা নাটক লেখা হল সেখানে ভারতচন্দ্র বাংলার বীরকে এভাবে চিত্রিত করবার কারণ কী?

নবাবি আমলের নবাবরা কেউই সেরকম ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আলিবর্দ্দিও শাসন ব্যাপারে কোনও প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিতেন না—যদিও তাঁহারা নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন।"৪ সে-সময় মুসলমান নবাব বা ওমরাহরা হিন্দু উৎসবে যোগ দিত। শোনা যায়, সাহামৎজঙ্গ এবং সৌকৎজঙ্গ মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের বাগানে সাতদিন ধরে হোলি খেলেছিলেন। সিরাজও 'আলিনগর সন্ধি' সেরে মুর্শিদাবাদে হোলি উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। মিরজাফরও পাটনায় নিয়মিত হোলি খেলতেন। কুষ্ঠব্যাধির সময় মীরজাফর যখন মৃত্যুশয্যায়শায়িত তখন কিরীটিশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করানো হয়েছিল।

কিরীটিশ্বরী মন্দিরে নতুন প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তি

অন্যদিকে হিন্দুরাও মুসলমান পীর-ফকিরদেরও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের কোনো কোনো পুঁথিতে আছে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ও কোরান একসঙ্গে রাখা থাকত। মুসলিম সমাজে হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষভাবে মান্য করা হত।

"সরফরাজ ও আলিবর্দ্দি যুদ্ধযাত্রা বা কোন শুভকার্যের পূর্বে হিন্দুর জ্যোতিষীকে আনাইয়া ভবিষ্যৎ গণাইয়া লইতেন, মীরকাশীম নিজেও হিন্দুপণ্ডিত রাখিয়া জ্যোতিষবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক মুসলমান কবি ইসলামী কাব্যরচনার প্রারম্ভে হিন্দু দেবদেবীরও বন্দনা গাইয়াছেন। তেমনি আবার মহরম উৎসবে হিন্দুরাও যোগ দিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় উদারতা লক্ষ্য করা যায়। দৌলতরাও সিন্ধিয়া মহরম উৎসবে প্রজাদের সবুজ পোষাক পরিধান করিয়া ঐ উৎসবে নিষ্ঠা সহকারে যোগ দিতেন। দিল্লী দরবারের আনুকূল্যে দুর্গোৎসব হইত—এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। হ্যামিলটন বুকানন ঊনবিংশ শতাব্দীতেও দেখিয়াছিলেন যে, ভাগলপুর অঞ্চলে হিন্দুমুসলমানে মিলিয়া মহরম উৎসব করিত।"৫

মীরকাশীম

'অন্নদামঙ্গল' বিশ্লেষণে দেখা গেল, কবি ভারতচন্দ্র প্রথমখণ্ডে ইতিহাসকে অনেকখানি গ্রহণ করেছেন। তবে সেক্ষেত্রেও তাঁকে রাজার আদেশ মেনে চলতে হয়েছে। তৃতীয়খণ্ডে ইতিহাসকে তেমনভাবে অনুসরণ করেননি। এক্ষেত্রে মনে হয় তিনি মঙ্গলকাব্যের সাধারণ 'ফর্ম'টি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে কাব্যের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, কবি ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত গোঁড়ামিকে পছন্দ করতেন না। ব্যাস প্রসঙ্গে তার পরিচয় মেলে। তবে যুগেযুগে মানুষ নিজের ধর্মকে ভালবাসে। আর সেই ভালবাসার খাতিরেই নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অন্য ধর্মকে সাময়িকভাবে ছোটো করতে চায়। সেক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম, বৈষ্ণব-শাক্ত, বৌদ্ধ-জৈন যে কোনো ধর্মমতের সঙ্গে হতে পারে। এটা কোনো জাতিগত বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িক হিংসা নয়। নিজের ধর্মকে কেউ ভালবাসতেই পারে, তবে অপরের ধর্মের ক্ষতি করে নয়। আর এটাই হল ভারতচন্দ্রের অন্তর্নিহিত কথা। ভারতচন্দ্র যেহেতু মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবি তাই মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি (যেমন বিভিন্ন জাতির বর্ণনা, বিধর্মী দিয়ে পূজাপ্রচার) বজায় রাখতে হয়েছে। আর সামাজিক বা রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায়, নবাবরা তেমন ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না, অবশ্য কেউ কেউ ব্যতিক্রম আছেন। তবে সবাইকে এক মানসিকতায় ফেলা যায় না। অনেকেই ধর্ম ব্যাপারে উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানরা পাশাপাশি বাস করত এবং একে অপরের ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করার রীতিও ছিল। ভারতচন্দ্র সম্পর্কে যে কথা বলার তা হল তিনি ইতিহাসের পটভূমিকাকে কাব্যের বিষয় করে তুলেছেন এবং দেবতাকে মানব করে মধ্যযুগের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করেছেন। এখানেই তাঁর আধুনিক মানসিকতা ও স্বতন্ত্রতার পরিচয় মেলে।

(১) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্তদাস (সম্পাদিত) ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৬৯।
(২) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; মডার্ণ-২০০০।
(৩) তদেব।
(৪) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৩য় খণ্ড)-মডার্ণ।
(৫) তদেব।

প্রসঙ্গ ছাতিনা কান্দী: রাজার দিঘির পাড়ের পটুয়া বসতি

দীপাঞ্জন দে

মুর্শিদাবাদের পটুয়া সম্প্রদায় বৃহত্তর বেদিয়া বা বেদে জাতির অংশ। এরা একপ্রকার যাযাবর জীবনযাপন করতেন বা এখনও করেন। তাঁরা নিজেরাই বলে থাকেন যে,আমরা তো যাযাবর বেদিয়া জাতি। মুর্শিদাবাদের ছাতিনা কান্দী অঞ্চলের বেদে পটুয়ারাও ব্যতিক্রম নন। মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কান্দী বাসস্ট্যান্ড প্রায় ৩০ কিমি পথ, বাসে যেতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। সেখান থেকে ছাতিনা কান্দী গ্রামের ভেতর প্রায় আড়াই কিমি গেলে রাজার দিঘির পাড়। সেখানেই গ্রামের বেদে পটুয়ারা বসবাস করেন। রাজার দিঘির পাড়ে বর্তমানে প্রায় ২৩ ঘর পটুয়া পরিবারের বাস। দিঘির দুই পাড় ঘেঁষে পটুয়া ঘরগুলি তৈরি হয়েছে। বর্তমানে দিঘির পূর্ব পাড়ে প্রায় ১০-১১ ঘর এবং পশ্চিম পাড়ে প্রায় ১৩ ঘর পটুয়া পরিবারের বাস।[১]

এই গ্রামের পটুয়ারা অধিকাংশই পটের খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ছাতিনা কান্দীর পটশিল্প-র করুণ দশা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মুর্শিদাবাদের পটের একটি অন্যতম ঘরানা হল 'কান্দি ঘরানা'-র পট। এই ঘরানার পট খুব বিখ্যাত ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে একসময় এই জেলার 'গণকর ঘরানা'-র পটের খুব সুনাম ছিল। দেশবিদেশে এই জেলার পটের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক সংগ্রহশালায় মুর্শিদাবাদ জেলার পট এখনও দেখতে পাওয়া যায়।[২] কিন্তু যুগের পরিবর্তনে মুর্শিদাবাদের পটশিল্প খুবই সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। পটচিত্রের পরিমাণ যেমন কমেছে তেমনই পটের গান হারিয়ে যেতে বসেছে। নতুন প্রজন্মের পটুয়ারা বেশিরভাগই তাদের প্রাচীন পেশা ত্যাগ করেছে। ছাতিনা কান্দীর রাজার দিঘির পাড়ের কেবলমাত্র একটি পরিবার পটের খেলা দেখানোর সঙ্গে যুক্ত। সেই পরিবারটি হল আনন্দ পটুয়ার পরিবার। পরিবারের প্রধান আনন্দ পটুয়া পট খেলাতে জানেন। তবে বর্তমানে তিনি আর তেমনভাবে পটের খেলা দেখান না। তার প্রধান জীবিকা প্যান্ডেলের কাজ করা। আনন্দ পটুয়া মাঝেমধ্যে পট নিয়ে বার হতেন এবং ভিক্ষা হিসেবে চাল, মুড়ি, আলু, পটল, কখনওবা খুচরো পয়সা পেতেন। তার পরিবারের আরেকজন পট খেলাতে জানেন। তিনি হলেন আনন্দ পটুয়ার ছোটো ছেলে কানন পটুয়া। তবে অসুস্থতাজনিত কারণে সে পট নিয়ে কমই বের হয়। সুতরাং এখন ছাতিনা কান্দীতে পট খেলায় সক্রিয় পটুয়া তেমন নেই বললেই চলে।

এবার পটচিত্র আঁকা প্রসঙ্গে আসা যাক। রাজার দিঘির পাড়ের পটুয়াদের মধ্যে পটচিত্র আঁকেন প্রশান্ত পটুয়া। তিনি ছাড়া এই গ্রামে আর কেউ পটের ছবি আঁকেন না। প্রশান্ত পটুয়া একটি আঁকার স্কুলে আঁকা শেখান এবং ছোটো বাচ্চাদের টিউশন করেন। সেটাই তার প্রধান জীবিকা। অবসর সময়ে তিনি পটের ছবি আঁকেন।[৩]

উল্লেখ্য, পটুয়ারা পট আঁকাকে 'পট লেখা' বলে থাকেন। যদিও এই ছাতিনা কান্দীতে একথা শুনতে পাই না। পটের চলন কমে যাওয়ায় যেমন মুর্শিদাবাদের পটুয়ারা তাঁদের শিল্পের অনেক কলাকৌশল ভুলেছেন তেমনই প্রাচীন কিছু কিছু রীতিনীতি ও অভ্যাস তাঁদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা আর 'পট লেখা' কথাটা ব্যবহার করছেন না। বাংলার পটুয়াদের আরেকটি প্রধান কাজ ছিল মূর্তি গড়া। কিন্তু বর্তমানে এই জেলায় মূর্তি গড়েন এমন পটুয়া পাওয়া দুষ্কর। মুর্শিদাবাদ জেলার পটুয়ারা

প্রশান্ত পটুয়া নিজের বাড়িতে পটচিত্র আঁকছেন

প্রশান্ত পটুয়া যে কালীমূর্তিটি প্রায় দেড় দশক কাল ধরে করে আসছেন। গ্রামের হাজরা বাড়ির কালী প্রতিমা।

বেশিরভাগ ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং সেখানে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করা হয়। যদিও এই জেলার গণকর গ্রামের পটুয়াদের উপাধি 'চিত্রকর' এবং তাঁরা ধর্মীয় দিক থেকে হিন্দু পরিচয় বহন করেন। তাঁরা হিন্দুদের মতোই জীবনযাপন করেন।

রাজার দিঘির পাড়ের বেদে পটুয়ারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিয়ে থাকলেও তাঁদের জীবনচর্যায় অনেক হিন্দু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন তাঁরা মনসাদেবীকে খুব মানেন। গরু পালনের উপকারিতার কথা পটের গানের মধ্য দিয়ে প্রচার করেন। এখন যদিও পটুয়া সংগীত হারাতে বসেছে। বেশিরভাগ পটুয়া সংগীত চর্চার অভাবে তাঁদের স্মৃতি থেকে ক্রমশ্যঃ মুছে গিয়েছে। দুই একটি গান তাঁদের মনে রয়েছে। সেই গানগুলি ছাতিনা কান্দীর আনন্দ পটুয়া, সমীর পটুয়া ও সিরাজ পটুয়ার থেকে এখনও শুনতে পাওয়া যায়।

রাজার দিঘির পাড়ের পটুয়াদের মধ্যে প্রশান্ত পটুয়াকে কেবলমাত্র মূর্তি গড়তে দেখা যায়। তিনি গ্রামের হাজরা বাড়ির কালী প্রতিমাটি প্রথম থেকেই তৈরি করে আসছেন। তবে এই কালী প্রতিমাটি ছাড়া তিনি সেভাবে মূর্তি গড়ার সঙ্গে যুক্ত নন। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এই কালী পূজা সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি গল্প জানা যায়। প্রশান্ত পটুয়া এই কালী পূজাতে উপোস করেন বলে জানান। ছোটো বেলা থেকেই এই প্রতিমাটি প্রশান্ত পটুয়া গড়েন। প্রায় দেড় দশক ধরে এই পূজা হচ্ছে। লোকমুখে একটা কাহিনি শুনতে পাই যে, একবার ধনঞ্জয় হাজরার বাড়ির কালী পূজায় বাজারের কেনা প্রতিমা আনা হলে গৃহস্থের কিছু সমস্যা হয়।[৪] তারপর থেকে আবার হাজরা বাড়ির কালী প্রতিমাটি প্রশান্ত পটুয়াই গড়েন। কিন্তু প্রশান্ত পটুয়ার ধর্ম পরিচয়টি হল—তিনি একজন মুসলিম, বাড়িতে কোরান শরিফ রয়েছে। যদিও পাঁচ বার নমাজ পড়া তাঁর হয় না, কিন্তু মসজিদে যাতায়াত রয়েছে। রমজান মাসে বাড়িতে রোজা রাখার রীতিও কম-বেশি মানা হয়। এক্ষেত্রে পটুয়াদের মধ্যে একটা ধর্মীয় সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের ধর্ম পরিচয় যাই হোক না কেন, তারা ধর্মীয় জীবনচর্যায় অনেক স্বাধীনতা ভোগ করেন। যেমন ছাতিনা কান্দীর বেদে পটুয়ারা অনেক ইসলামিক রীতিনীতি পালন করেলেও অনেক হিন্দু রীতিনীতিও তাঁদের পালন করতে দেখা যায়। রাজার দিঘির পাড়ের বাবলু পটুয়ার পরিবার যেমন হিন্দু রীতিনীতি বেশি মেনে চলেন। তাঁদের কথায় আমরা বেদে জাত, আমরা সব ধর্ম পালন করতে পারি। আমাদের কাছে সবই সমান। তবে আমাদের নমাজ পড়া হয় না। আমরা গরু খাই না। আমরা মনসা পূজা করি। আমাদের পরিবারে মুসলমানি এখন হয় না। বাবলু পটুয়া বলেন, 'আমাদের সময় হয়েছিল, কিন্তু এখন আর তেমন দেখা হয় না'।[৫]

এই ধর্মীয় কারণের জন্যই হয়ত পটুয়াদের অনেককে দুটি নাম ধারণ করতে দেখা যায়। তাঁদের অনেকের যেমন একটি হিন্দু নাম থাকে, তেমনই একটি মুসলিম নাম থাকে। বিশেষত আগে যেসব মুসলিম পটুয়াকে হিন্দু সমাজে পট নিয়ে চলাফেরা করতে হত, তাঁরা অবশ্যই দুটি নাম ধারণ করতেন। আবার মুসলিম সমাজে চলাফেরার জন্য একটি মুসলিম নাম থাকত। এখন যদিও পট খেলানোর প্রচলন কমে

যাওয়ায় পটুয়াদের এই দুটি নাম ধারণ করার চলন কমে গেছে। এই গ্রামের প্রশান্ত পটুয়ার যেমন পূর্বে আরেকটি নাম ছিল মোস্তাকিম পটুয়া। এখন আর সেই নাম তিনি তেমনভাবে ব্যবহার করেন না। ছাতিনা কান্দীর আনন্দ পটুয়া আগে পট নিয়ে ভিক্ষা করতে যেতেন। এখন আর যেতে পারেন না। তাঁর বর্তমান বয়স ৬৭ বছর। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি তিনি মোট চারটি পটের গান জানতেন। সেগুলি হল—গরুর পটের গান, নিমাই সন্ন্যাসী পটের গান, সিন্ধু বধ পটের গান এবং সীতাহরণ পটের গান। কিন্তু এখন আর সবকটি গান তার ভালোভাবে মনে নেই। শেষোক্ত গান দুটি তিনি পুরোপুরি ভুলে গেছেন। প্রথম দুটি পটের গান বলার মতো অবস্থায় কিছুটা রয়েছে।[৬] তিনি তার ছোটো ছেলে কানন পটুয়াকে এই গান দুটি শিখিয়েছেন। সুতরাং এর থেকেই অনুমান করা যায় যে আস্তে আস্তে ঐতিহ্যমণ্ডিত পটুয়া সংগীত হারাতে বসেছে। এর অন্যতম কারণ হল পটুয়াদের তাঁদের পিতৃপুরুষের পেশা থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং গ্রামবাংলায় পটের চাহিদা কমে যাওয়া। যেমন আনন্দ পটুয়ার বড়ো ছেলে সুজয় পটুয়া পটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হননি। তিনি পড়াশোনা করেছেন। এখন তিনি ভরতপুর আলিয়া হাইস্কুলে ক্লার্ক পোস্টে কাজ করেন।[৭] বেশিরভাগ পটুয়া পরিবারেই এই একই অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের নতুন প্রজন্মের পটুয়ারা পটশিল্পের সঙ্গে আর যুক্ত হচ্ছেন না। ছোটো ছেলে কানন পটুয়া শারীরিক কারণে পড়াশোনা না করায় পট নিয়ে ভিক্ষা করেন। গ্রামের বাবলু পটুয়া পটশিল্পের অবনতির কারণ প্রসঙ্গে বলেন—'পটের থেকে তো আর ভালো ভাবে সংসার চলে না। পট বলে তো কোন মানুষের আর আক্ষেপ নাই। পুরোনো মানুষ কি আর আছে? আজ থেকে যদি পঁচিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যাওয়া হয়, তবে পঞ্চাশ বছর আগেকার লোকগুলো একটাও নাই। এখন সব নতুন। নতুনরা পট বললে বলে—ওরা পেটের তাগিদে এসেছে। কি আছে ছবিতে, কত দেখেছি। সিনেমা বাদ দিয়ে কি আর এইসব দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তো আর বোঝে না।'[৮] বাবলু পটুয়ার থেকেই জানতে পারি যে সেখানে পুলকেন্দু সিংহের উদ্যোগে পটশিল্পের একটি স্কুল খুলেছিল। তিনি বলেন—'আজ থেকে.. না হলেও কুড়ি বাইশ বছর, কি পঁচিশ বছর হবে পুলকেন্দু সিংহের আমি ছাত্র ছিলাম। আমাদের এখানে একটা সংস্থা খুলেছিল-পটচিত্র কলা স্কুল। কিছুদিন সরকার পয়সাও দিয়েছিল। ওটা বন্ধ হয়ে যায়। ওঁর কেমন ছাত্র ছিলাম আমি উনিই বলবেন। ওখানে আমরা পট আঁকতাম।..... যখন পটচিত্র কলা স্কুল উঠে গেল, তখন আমরা পট ছেড়ে দিলাম।'[৯]

আনন্দ পটুয়া ও কানন পটুয়া

ছাতিনা কান্দী গ্রামের আনন্দ পটুয়ার থেকে জানতে পারি তাঁকে পটের গান শিখিয়েছেন

ষাটলসার প্রয়াত বাকু পটুয়া। তিনি পূর্বেকার কথা স্মরণ করে বলেছেন যে বাকু পটুয়ার কাছ থেকে তিনি পটচিত্র নিয়ে ও পটের গান শিখে পট নিয়ে গ্রামে গঞ্জে ভিক্ষা করে বেড়াতেন। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় বাকু পটুয়া শিল্পী হিসেবে বেশ নাম করেছিলেন। তিনি ধর্ম পরিবর্তন করে হিন্দু হয়েছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন—'আমি বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নিয়েছি। আমার গুরুদেবের নাম হচ্ছে শ্রী চরণ গোঁসাই। আর দীক্ষা নিয়েছি তিনি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। তাঁর বাড়ি হচ্ছে খোসবাগপুর, মুর্শিদাবাদ জেলার গোকর্ণের সন্নিকটে। ব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষা নিয়েছি--দেহ পবিত্র। আর মন্ত্র জপের জন্য বৈষ্ণবদিগের গুরু করতে হয়।'[১০] যাইহোক আনন্দ পটুয়া 'নিমাই সন্ন্যাসীর জন্ম' পটটির গান শোনালেন। সেই গানটি যন্ত্রস্থ করেছি। আগামী দিনে হয়ত এই গানটিও হারিয়ে যাবে। যেমন ছাতিনা কান্দী তথা মুর্শিদাবাদের অনেক প্রাচীন পটের গান ও পটের ছবি হারিয়ে গেছে। সেগুলি আর পাওয়া যায় না। কিছু পুরোনো পট বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। কিন্তু পুরোনো সেইসব পটের গান পটুয়াদের স্মৃতিতে আর নেই বা যন্ত্রস্থ করাও নেই। আনন্দ পটুয়া পটের গান জানলেও পট আঁকতে জানেন না। তার দেখানো নিমাই সন্ন্যাসীর পটটি এঁকেছেন মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপীর রাজেন পটুয়া।[১১]

প্রশান্ত পটুয়া গরুর পট দেখাচ্ছেন

আনন্দ পটুয়ার শোনান পটের গানটির কথা নিচে লিপিবদ্ধ করা হল:

আর নদীয়ার মধ্যে আছে আছে ও যার জগাই আর মাধাই/হরি বলে বাহু তুলে নাচে দুটি ভাই
আর নদীয়ার মধ্যে আছেন আছে ও যার শচীমাতা রানী/আর তাহার গর্ভে জন্ম নিল নিমাই গুণমণি
আর শ্বেত মাছের রূপ ধারণ করে নিমাই গর্ভেতে মেশালে/আর এক মাস দুইমাস ও যার তিন মাস হল
আর চার মাস পঞ্চ মাস ও যার ছয় মাস হল/আর সাত মাসের পরে শচীমাতাকে সাধ খাওয়ানো হল
আর আট মাস নয় মাস ও যার দশ মাস হল/আর দশ মাস দশ দিন পরিপূর্ণ হল
আর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় নিমাই ভূমিষ্ঠে পড়িল/আর দাই রূপে বসুমতী ও যার হস্ত পেতে নিল
আর সুবর্ণ চাকুতে নিমাইয়ের নাড়ি ছেদন হল/আর আওয়ালে ঝাওয়ালে দিচ্ছেন দিচ্ছেন শচীমাতার কোলে
আর লক্ষলক্ষ চুমু খাচ্ছে বদন কোমলে/আর এক মাস দুই মাস ও যার তিন মাস হল
আজ চার মাস পঞ্চ মাসের পরে নিমাইয়ের মুখে ভাত হল/আজ থেকে নিমাই দিনের দিন বাড়িতে লাগিল

"চোখ দুটো তুলে নিয়ে গঙ্গাজলে দিল/জিভটাকে কেটে নিয়ে কলার পাতায় থুল"–গরুর পটের 'যমের পালা' অংশটি গান গেয়ে শোনাচ্ছেন কানন পটুয়া। পাশে দাঁড়িয়ে পিতা আনন্দ পটুয়া।

আর এক বছর দুই বছর ও যার তিন বছর হল/আর চার বছর পঞ্চ বছর পরে নিমাইয়ের হাতে খড়ি হল
আর লেখাপড়া করে নিমাই নিমাই পণ্ডিত বড়ো দড়/আর সকল ছেলের পড়া হল নিমাইয়ের না হল
আজ ক্রোধিত হয়ে পন্ডিত নিমাইকে মারিল/আর কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই তখন তমাল তলায় গেল
আর ষড়ভুজা মূর্তি ধারণ করে নিমাই/নিমাই ও যার পন্ডিতকে দেখাল
আর গলায় বস্ত্র দিয়া পন্ডিত পন্ডিত কহিছে বচন/অপরাধ ক্ষমা কর শচীর নন্দন
এইখান থেকে যমরাজা যমপুরীর কাহিনী শুরু করি ভাই/বিনা অপরাধে ও যার দন্ড দিতে নাই
আজ ভানানি চাল যেজন ভুল করে খায়/যমপুরী যমালয়ে তার মস্তক ওপার দেয়
আজ নিজের পতি থাকতে যেজন পর পতিকে ধায়/খাজুর গাছে তুলে তাকে উচিত শিক্ষা দেয়
আজ হেরে মুণি বেশ্যা ছিলেন মহা পাপের পাপী/অন্নদান, বস্ত্রদান,গাভিদান অনেককিছু দানধ্যান করেছিল
তাই তা থেকে পুষ্পরথে চড়িয়ে স্বর্গে নিয়ে গেল/এই কথা বলিয়া আমি যমপুরী যমালয়ের কাহিনী শেষ করিলাম তাই।।[১২]

বর্ণনাকারী: আনন্দ পটুয়া, ঠিকানা–রাজার দিঘির পাড়,ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭।

সংগ্রহ তারিখ: ৫ই কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শনিবার (২২.১০.১৬)।

আনন্দ পটুয়ার গাওয়া পটের গানের শেষের দিকে রয়েছে 'যমের পালা', যেখানে যমরাজা পাপীদের কিভাবে শাস্তি দেয় তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এই যমের পালার মাধ্যমে সমাজ সংশোধনের এক বার্তা দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায় পটুয়ারা একদিকে যেমন গণমনোরঞ্জক, তেমনই তারা লোকশিক্ষকের কাজও করেন। প্রাচীন কাল থেকেই পটুয়ারা তাঁদের পটের গানের সঙ্গে 'যমের পালা' শোনায়। এখন বরং তাঁরা যমের পালা কখনও গায়, কখনও গায় না। কিন্তু পটুয়া সংগীতের নিয়ম হল গানের শেষে 'যমের পালা'য় অপরাধীকে শাস্তিদানের কথা থাকবে। যমরাজা যে যোগ্য বিচার করে পাপ অনুযায়ী দোষীদের উচিত শাস্তি দেবেন—সে কথা গানের মধ্যে দিয়ে বলা হয়। রাজার দিঘীর পাড়ের কানন পটুয়া গরুর পটটি দেখান। পটচিত্র ও পটের গানের মধ্যে গরুর পট চিত্র ও সেই বিষয়ক পটের গানটিই মুর্শিদাবাদে তুলনামূলক বেশি দেখা বা শোনা যায়। ইতিপূর্বে মুর্শিদাবাদের অন্যান্য গ্রামের পটুয়া পাড়া বা বেদে পাড়া থেকে কয়েকটি পৃথক পৃথক গরুর পটের গান সংগ্রহ করেছি। এই গানগুলি সবই ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলার এই বিশিষ্ট লোকসংগীতের ধারাটি তাই বর্তমানে চরম সংকটে। যাইহোক ছাতিনা কান্দীর কানন পটুয়ার কাছ থেকে

পাওয়া গরুর পটের গানটির কথা নিচে লিপিবদ্ধ করা হল:

আজ গরু বড় ধন মাগো পুত্র বড় ধন/আর যাহার ঘরে গরু নাই মা বৃথা ওই জীবন।
আজ ইন্দ্ররাজ দেবগণে যার সকলের দেবতা/কপিলার সঙ্গে গুরু কয়েছিলেন কথা।
আজ মা কপিলা স্বর্গে ছিল মর্তে নেমে এল/নরলোকের ঘরে ঘরে পূজিতে লাগিল।
এক গোয়ালিনীর সাত বৌ ছিল/সাত দিনে সাত বৌয়ের পালি(ক)করে দিল।
আজ প্রথম গোয়াল কাড়া(খ)পালি বড় বৌয়ের হল/আজ বড় বৌটি বলে মাগো গায়ে এল জ্বর
আমি গোয়াল কাড়িতে পাড়িব না নিকাইব(গ)ঘর/মেজ বৌটি বলে মা যার জ্বালার ওপর জ্বালা।
ভেবেচিন্তে দেখ মাগো ন-বৌয়ের পালা/আজ ন-বৌটি আলার ঘরের দুলো।
গোয়াল কাড়িবার নাম শুনে গায়ে মাখতে লাগলো ধূল/আর একটা বৌ থাকে মা তার নামটি রুমা।
মাথায় তার চুল নাই মা পিঠ পাঁচ ছয় দড়ি/আজ মেজ বৌ সেজ বৌ চাল ধুতে যায়।
চাল ধুতে যেতে বৌমা খাবল পাঁচ ছয় খায়/ আর একটা বৌ থাকে মা কপাটেরই আড়ে।
লাফ দিয়ে পড়ে মাগো বড় ভাশুরের ঘাড়ে/আর একটি বৌ থাকে মা তার নামটি হালা
গোয়াল কাড়িতে যায় বৌ ঠিক দুপুরবেলা/এসো বৌমা ছোট বৌ কুলেরই নন্দন
আজ তোমা হতে হবে কিছু গরুরই পালন/পড়তে দিল বৌকে ধুবাই পাটের শাড়ি(ঘ)
গোয়াল কাড়িতে দিল বৌকে ঝাঁটা আর ঝুড়ি/রম ঝম করে বৌমা গোয়ালে দিল পা
খিঁচ গোবর(ঙ) দেখে বৌমা কপালে মারে ঘা/চোখ ছিল না মাতা পিতার চোখ ছিল না ভাইয়ের
দেখে শুনে বিয়ে দিল গরুওয়ালার ঘরে/তাই
সুবুদ্ধির বৌটি কুবুদ্ধি ঘটাইল
ধরিয়া ঝাঁটার বারি গাভিকে মারিল/পঞ্চমাসের
গর্ভ গাভি খসিয়া পড়িল
কাঁদিতে কাঁদিতে পাল চলিতে লাগিল/ভালোই
হল শ্বশুর বাড়ির পাল ঘুচে গেল
তখন চালের বাতা(চ)ধরে নাচিতে লাগিল/সেই
পথে আসছে দেখ দুগ্ধ নীলবতী
তেনার কাছে বিদায় নিচ্ছেন লক্ষ্মী ভগবতী/তোমার
বাড়ির বৌ শুনি কুলেরই নাগর(ছ)
আজ মেরেছে ঝাঁটার বাড়ি ভেঙ্গেছে
পাঁজর/ফিরে চল মা কপিলা ফিরে চল বাড়ি
তোমার সাক্ষেতে বৌকে দেব নরবলি/নাপিত
ডাকিয়া বউয়ের কেশ মুড়াল
ব্রাহ্মণ ডাকিয়া বৌয়ের নরবলি দিল/হাতের
দশটি আঙুল কেটে পলিতা(জ) পাকাল
হুটোর মালুই নিয়ে প্রদীপ বানাইল/মাথার খুলি
নিয়ে ধুপুসী(ঝ) বানাইল
চোখ দুটো তুলে নিয়ে গঙ্গাজলে দিল/জিভটাকে
কেটে নিয়ে কলার পাতায় থুল
সাত দিন সাত রাত ধূপধুনা দিল/তবেই না
নবলক্ষীর পাল বাড়ি ফিরে এল
একলক্ষ ছিল পাল ছলক্ষ হল/বছরে বছরে
পাল বাড়িতে লাগিল
আমার নাম কানন পটুয়া বাড়ি হচ্ছে ছাতিনা
কান্দী রাজার দিঘীর পাড় জেলা মুর্শিদাবাদ।[১৩]

ক) পালি: পালা/পর্যায়, খ) গোয়াল কাড়া: গোয়াল পরিষ্কার করা,

প্রশান্ত পটুয়া গরুর পট দেখাচ্ছেন।

আনু পটুয়া তালাই বুনছেন।

গ) নিকানো: গোবরগোলা বা মাটি গোলা জল দিয়ে লেপা, ঘ) পাটের শাড়ি: রেশমের শাড়ি, ঙ) খিঁচ গোবর: চোনা মিশ্রিত গোবর, চ) চালের বাতা: ঘরের ছাওনির আড়া/আড়াআড়ি স্থাপিত বাঁশ, ছ) নাগর: ভালোবাসার পাত্র/প্রণয়ী, জ) পলিতা: সলতে, ঝ) ধুপুসী: ধুনুচি।

বর্ণনাকারী: কানন পটুয়া, ঠিকানা– রাজার দিঘীর পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭।

সংগ্রহ তারিখ: ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬)।

ছতিনা কান্দীর পটুয়াদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার পটুয়া রয়েছেন। বাড়ির মহিলারা তালাই বোনেন বা গোয়াল কাড়ার কাজ করেন। প্রশান্ত পটুয়ার শাশুড়ি মা চিনি পটুয়া ও দিদিমা আনু পটুয়াকে নারকেল পাতার তালাই বুনতে দেখতে পাই। এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করতে হয় যে, বেশিরভাগ পটুয়া মহিলাকে খেজুর পাতার তালাই বুনতে দেখা যায়। যেমনটি মুর্শিদাবাদের করবেলিয়া গ্রামে, আমলাই গ্রামে বা পাঁচথুপী গ্রামে দেখতে পেয়েছি।[১৪] কিন্তু রাজার দিঘির পাড়ের আনু পটুয়া, চিনি পটুয়ার নারকেল পাতার তালাই বোনার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব খুঁজে পাই। তারা যে শুধু নারকেল পাতার তালাই বোনেন তাই নয়, খেজুর পাতার তালাইও তারা বুনে থাকেন। নারকেল পাতার তালাই তারা বাজারে প্রায় ৬০-৭০ টাকায় বিক্রি করেন এবং খেজুর পাতার তালাই প্রায় ১০০ টাকায় বিক্রি হয়। আগে এই গ্রামে সানা তৈরি করাও হত। কিন্তু এখন আর সানা বাঁধার কাজ এই গ্রামের পটুয়ারা করেন না। যদিও এই জেলার পাঁচথুপীর লুৎফুন পটুয়া এখনও সানা বাঁধেন।[১৫] ছাতিনা কান্দীর বেশ কয়েকটি পটুয়া পরিবার সাপ ধরা ও সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন সমীর পটুয়ার পরিবার ও সিরাজ পটুয়ার ছেলেরা সাপের খেলা দেখায়। সমীর পটুয়ার থেকে সাপের খেলার গান সংগ্রহ করেছি।[১৬] তিনি প্রতিদিন সাপ নিয়ে দূরদূরান্তে বেড়িয়ে যান। সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়ান। বেলাশেষে গ্রামে ফেরেন। এই গ্রামের ধীরাজ পটুয়া সাপ ধরেন ও কবিরাজি চিকিৎসা করেন।[১৭] গ্রামে বা কাছাকাছি এলাকায় কাউকে সাপে কামড়ালে তার ডাক পরে, তাঁকে সাপের বিষ তুলতে যেতে হয়। তাঁর স্ত্রী খেজুর পাতার তালাই বোনেন এবং বাজারে সেগুলি বিক্রি করেন। সবমিলিয়ে বলতে পারি মুর্শিদাবাদের রাজার দিঘির পাড়ের পটুয়ারা তাঁদের পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য যেমন কিছুটা আঁকড়ে আছেন, তেমনই সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেককিছু তাঁদের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছে, যা ফিরে পাওয়া দুষ্কর।

সূত্র নির্দেশ :

১) ক্ষেত্র সমীক্ষা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭, তারিখ: ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬)।

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে কান্দী বাসস্ট্যান্ড প্রায় ৩০ কি.মি. পথ, বাসে যেতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা। সেখান থেকে গ্রামের ভেতর প্রায় আড়াই কিমি গেলে রাজার দিঘির পাড়ে গ্রামের বেদে পটুয়ারা বসবাস করে।

২) উদাহরণস্বরূপ ঠাকুরপুকুরের গুরুসদয় সংগ্রহশালায় মুর্শিদাবাদ জেলার 'গণকর' ঘরানার 'কৃষ্ণলীলা' ও 'রামলীলা' দীঘল পটচিত্র দুটি সংরক্ষিত রয়েছে।

৩) সাক্ষাৎকার: প্রশান্ত পটুয়া(মোস্তাকিম পটুয়া); বয়স: ৩১ বছর; পেশা: গ্রামে টিউশন করেন, আঁকার স্কুলে আঁকা শেখান, পটের ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন; শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পাস; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো:কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭; তারিখ: ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

৪) সাক্ষাৎকার: ধনঞ্জয় হাজরা; বয়স: ৪৫ বছর; পেশা: ভ্যান চালান; শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিরক্ষর; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭; তারিখ: ৩রা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., বৃহস্পতিবার (২০.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

৫) সাক্ষাৎকার: বাবলু পটুয়া; বয়স: ৫৫ বছর; পেশা: প্যাণ্ডেলের কাজ করেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিরক্ষর; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭; তারিখ: ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

৬) সাক্ষাৎকার: আনন্দ পটুয়া; বয়স: ৬৬ বছর; পেশা: পটের খেলা করতেন, প্যাণ্ডেলের কাজ করতেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো:কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭; তারিখ: ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

৭) সাক্ষাৎকার: সুজয় পটুয়া; বয়স: ৩৮ বছর; পেশা: স্কুলের ক্লার্ক(ভরতপুর আলিয়া হাইস্কুল); শিক্ষাগত যোগ্যতা: গ্রাজুয়েট (নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়); আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭; তারিখ: ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

৮) সাক্ষাৎকার: বাবলু পটুয়া; পূর্বোক্ত।

৯) সাক্ষাৎকার: বাবলু পটুয়া;

১০) দীপঙ্কর ঘোষ, লোকশিল্পীর মুখোমুখি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০৫, পৃ-২৩০।

১১) সাক্ষাৎকার: রাজেন পটুয়া; বয়স: ৪৭ বছর; পেশা: দিনমজুর, ভেটেরিনারি চিকিৎসা করেন, পটচিত্র আঁকেন এবং বিক্রি করেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক পাস; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: পাঁচথুপী(ভাটপাড়া), পো: পাঁচথুপী, থানা: বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৬১; তারিখ: ৬ই কার্ত্তিক ১৪২৩ব., রবিবার (২৩.১০.১৬); স্থান: পাঁচথুপী।

১২) সাক্ষাৎকার: আনন্দ পটুয়া; পূর্বোক্ত, তারিখ: ৫ই কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শনিবার (২২.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

সমীর পটুয়া সাপ খেলা দেখাচ্ছেন।

ধীরাজ পটুয়া কবিরাজি চিকিৎসা করেন।

১৩) সাক্ষাৎকার: কানন পটুয়া; বয়স: ২৯ বছর; পেশা: পটের গান করেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিরক্ষর; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭; তারিখ: ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

১৪) ক. ক্ষেত্র সমীক্ষা: করবেলিয়া গ্রাম, পো: কাঁতুর হাট, থানা: বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩২; তারিখ: ১১ই কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২৮.১০.১৬)।

করবেলিয়া গ্রামে যেতে হলে বাসে করে জালি বাগান স্টপেজে নামতে হবে। বহরমপুর থেকে সড়কপথে প্রায় ১৯ মাইল এবং কান্দী থেকে সড়কপথে প্রায় ১০ মাইল রাস্তা।

খ. ক্ষেত্র সমীক্ষা: আমলাই পশ্চিম পাড়া, থানা: ভরতপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২৩০১; তারিখ: ১২ই কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শনিবার (২৯.১০.১৬)।

কান্দী থেকে সালার লাইনের বাস ধরে ভরতপুর নামতে হবে, প্রায় ৯-১০ কিমি রাস্তা সময় লাগে প্রায় ৩০ মিনিট। সেখান থেকে ভটভটি বা লাদেন গাড়ি চেপে প্রায় ৬-৭ কিমি গিয়ে আমলাই গ্রাম আসবে। হাসপাতাল মোড়ে নেমে হেঁটে আমলাইয়ের পটুয়া পাড়ায় যেতে হবে।

গ. ক্ষেত্র সমীক্ষা: পাঁচথুপী(ভাটপাড়া), পো: পাঁচথুপী, থানা: বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৬১; তারিখ: ৬ই কার্ত্তিক ১৪২৩ব., রবিবার (২৩.১০.১৬)।

কান্দী বাসস্ট্যান্ড থেকে বাইপাস হয়ে পাঁচথুপী গেলে প্রায় ১৪ কিমি রাস্তা, আর কুলি ও বড়ঞা হয়ে গেলে প্রায় ১৮ কিমি রাস্তা। কান্দী থেকে পাঁচথুপী যেতে প্রায় ১ ঘন্টা সময় লাগে। বাস থেকে নেমে ৫ মিনিট মতো হেঁটে পাঁচথুপীর পটুয়া পাড়ায় যেতে হয়।

১৫) সাক্ষাৎকার: লুৎফুন পটুয়া; বয়স: ৫১ বছর; পেশা: সানা বাঁধার কাজ করেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরক্ষর; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: পাঁচথুপী(ভাটপাড়া), পো: পাঁচথুপী, থানা: বড়ঞা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৬১; তারিখ: ২৭ শে কার্ত্তিক ১৪২২ব., শনিবার (১৪.১১.১৫); স্থান: পাঁচথুপী।

১৬) সাক্ষাৎকার: সমীর পটুয়া; বয়স: ৫০ বছর; পেশা: সাপ ধরেন এবং খেলা দেখান, কবিরাজি চিকিৎসা করেন, ভেটেরিনারি চিকিৎসা করেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিরক্ষর; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭; তারিখ: ৫ই কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শনিবার (২২.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

১৭) সাক্ষাৎকার: ধীরাজ পটুয়া; বয়স: ৬০ বছর; পেশা: সাপ ধরেন, কবিরাজি চিকিৎসা করেন, ভেটেরিনারি চিকিৎসা করেন; শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিরক্ষর; আর্থিক স্তর: নিম্নবিত্ত; ঠিকানা: রাজার দিঘির পাড়, ছাতিনা কান্দী, পো: কান্দী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৩৭; তারিখ: ৪ঠা কার্ত্তিক ১৪২৩ব., শুক্রবার (২১.১০.১৬); স্থান: ছাতিনা কান্দী।

এই বছরের ইস্কনের রথযাত্রায়
১৪ জুলাই জগন্নাথদেবের মূর্তির
সামনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইস্কনের মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী।

রেড রোডের নমাজে অংশ নিলেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৬ জুন, ২০১৮।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলকাতায়, তাজ বেঙ্গল হোটেলে। ২৬ মে, ২০১৮